মুজিববর্ষ স্মরণিকা

জ্যোতি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০ ও ২০২১

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

ttc.khulna.gov.bd

মুজিববর্ষ স্মরণিকা
জ্যোতি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২১
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
অধ্যক্ষ, সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, স্মরণিকা পরিষদ
অজয় কুমার সাহা
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত

সদস্য, স্মরণিকা পরিষদ
মোহাম্মাদ মহিবুল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

শবনম মনোয়ারা খানম
প্রভাষক, বাংলা

সম্পাদক
খালিদ সাইফুল্লাহ্
বিএড, রোল-৬৩, শিক্ষাবর্ষ-২০২১

সহ-সম্পাদক
স্মৃতিকণা অধিকারী
বিএড, রোল-৮৫, শিক্ষাবর্ষ-২০২১

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি-২০২২

গ্রাফিক্স
মোঃ অলিয়ার রহমান
০১৪০৫ ২৪ ৭৩ ৩৩

মুদ্রণ
রূপকথা প্রেস
সরকারি ব্রজলাল কলেজ রেল গেটের বিপরীতে
দৌলতপুর, খুলনা
০১৭০৩ ৬২ ৬০ ৬২

মুজিববর্ষ স্মরণিকা

জ্যোতি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০ ও ২০২১

সম্পাদনায়

স্মরণিকা পরিষদ

শিক্ষাবর্ষ : ২০২০ ও ২০২১

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

ttc.khulna.gov.bd

বাণী

দেশ ও জাতি গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো সুশিক্ষা। আর এই পূর্বশর্ত প্রতিপালনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রশিক্ষিত এবং দক্ষ শিক্ষক। সুদক্ষ শিক্ষক তৈরিতে প্রশিক্ষণের ভূমিকা অপরিসীম। দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা অন্যতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জন্মলগ্ন থেকে অত্যন্ত সুনামের সাথে এ দায়িত্ব পালন করে আসছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত শিক্ষকদের মেধা বিকাশ ও কর্মকুশলতা উন্নীতকরণে এ প্রতিষ্ঠানের নাম অগ্রগণ্য।

প্রতি বছর নতুন নতুন প্রশিক্ষণার্থীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে অত্র শিক্ষাঙ্গন। বিএড ও এমএড প্রশিক্ষণার্থী এবং বিএড অনার্সের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মুখরিত ছিল আমাদের প্রতিষ্ঠানটি। তাদের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রতি বছর প্রকাশিত হয় বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা 'জ্যোতি'। কিন্তু বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ আমাদের সেই চিরাচরিত ধারায় এনেছে ছন্দপতন। এই অলংঘণীয় প্রতিকূলতার মাঝেও মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ২০২০ ও ২০২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে মুজিববর্ষ স্মরণিকা 'জ্যোতি' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর উন্নয়ন, অসাম্প্রদায়িক চেতনা এবং শেখ রাসেলকে নিয়ে শিক্ষার্থীদের লেখা আমাকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত করেছে। আমার বিশ্বাস নতুন প্রজন্ম বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

এ বছর বিএড, এমএড ও বিএড অনার্সের শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যে পারদর্শিতা দেখেছি তা ছিল আমার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কিছু। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও মুজিববর্ষ স্মরণিকা 'জ্যোতি' প্রকাশের এ সৃজনশীল কাজে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পরিশেষে আমি কলেজ স্মরণিকা 'জ্যোতি'র উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করি।

প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
অধ্যক্ষ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

বাণী

পেশাগত দক্ষতা অর্জনে যেমন প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই তেমনি মনের মননশীলতা পরিস্ফুটনে সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। সাহিত্য জীবনের দর্পণ স্বরূপ। সাহিত্য চর্চায় মানুষ হয়ে ওঠে মহিমান্বিত, বিকশিত হয় মনের অনুভূতি।

দক্ষিণ বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাহিত্য-সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলি প্রশংসার দাবীদার। তাদের সেই স্মৃতিকে বহমান রাখার মানসে প্রতি বারের ন্যায় এবারও কলেজ বার্ষিকী 'জ্যোতি' প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু করোনার করাল থাবা আমাদের সেই অগ্রযাত্রাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। বৈশ্বিক মহামারীতে দীর্ঘদিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমাদের কলেজ বার্ষিকী প্রকাশেও ছেদ টানতে হয়েছে। এখন জীবনের প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ শেষে বিএড ও এমএড প্রশিক্ষণার্থীদের ফেরার পালা।

এ বছরের বার্ষিকী 'জ্যোতি' একটু ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। ২০২০ এবং ২০২১ শিক্ষাবর্ষে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন রচনা প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত রচনা এবং শিক্ষার্থীদের পরিচিতি স্থান পেয়েছে মুজিববর্ষ স্মরণিকা 'জ্যোতি'তে। আশা করি আগামীতে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকবৃন্দের হাতের ছোঁয়ায় বার্ষিকী 'জ্যোতি' নবরূপে এবং নব কলেবরে প্রকাশ পাবে।

অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীরা যে এ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছে তার জন্য আমি আনন্দিত। প্রকাশনা কাজে সহযোগিতার জন্য স্মরণিকা পরিষদের সদস্য জনাব মোহাম্মাদ মহিববুল্লাহ, সহকারী অধ্যাপক (বাংলা) ও জনাব শবনম মনোয়ারা খানম, প্রভাষক (বাংলা) এবং স্মরণিকা সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ ও সহ-সম্পাদক স্মৃতিকণা অধিকারীকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। বার্ষিকী 'জ্যোতি' সুষ্ঠুভাবে প্রকাশে মূল্যবান পরামর্শ দেওয়ার জন্য তৎকালীন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ নজরুল ইসলাম (অধ্যক্ষ, সরকারি শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বরিশাল) স্যারকেও অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

সর্বোপরি মুজিববর্ষ স্মরণিকা 'জ্যোতি' প্রকাশের ক্ষেত্রে মূল্যবান দিকনির্দেশনা ও সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য অত্র কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম স্যারকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা।

'জ্যোতি'র জ্যোতি আরও বিকীর্ণ হোক এই প্রত্যাশায়-

অজয় কুমার সাহা
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত
ও
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, স্মরণিকা পরিষদ
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

সম্পাদকীয়

"ঘুচিয়ে সকল অজ্ঞতা,
ফুটিয়ে জ্ঞানের আলো
ছুটিয়ে যাবে জ্যোতির তরী
টুটিয়ে আঁধার কালো"।

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্বে যখন স্থবিরতা বিরাজ করছে ঠিক এ মুহূর্তে "মুজিব শতবর্ষের অনুপ্রেরণা"- এ স্লোগানকে সামনে রেখে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে আরো গতিশীল ও প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে এক ঝাঁক দক্ষ ও আদর্শবান শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের অন্যতম শিক্ষক তৈরির কারিগর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা প্রতি বছরের ন্যায় ২০২০ এবং ২০২১ শিক্ষাবর্ষের জন্য প্রকাশ করতে যাচ্ছে মুজিববর্ষ স্মরণিকা "জ্যোতি"।

আমি কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহোদয় প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম স্যারের একান্ত পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদানকারী সহকারী অধ্যাপক জনাব অজয় কুমার সাহা স্যারের পাশাপাশি অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলি ও শিক্ষার্থী- প্রশিক্ষণার্থীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় "জ্যোতি" এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। এজন্য সর্বপ্রথম মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। যাদের লেখনীর দ্বারা "জ্যোতি" সৌন্দর্যমন্ডিত হয়েছে তাদের সকলের জন্য রইলো আন্তরিক অভিনন্দন।

নানা রকম সীমাবদ্ধতা ও সময় স্বল্পতার মধ্যেও সাহিত্য বার্ষিকীর মান অক্ষুন্ন রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রিয় পাঠক ও সুধীবৃন্দের দৃষ্টিতে কোন প্রকার ভুল বা মুদ্রণজনিত ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার বিনীত অনুরোধ করছি।

পরিসমাপ্তিতে, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলি, প্রশিক্ষণার্থী ও অন্যান্য শিক্ষার্থী এবং কর্মচারিবৃন্দ যারা এ মহান কাজটি সু-সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছেন তাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

খালিদ সাইফুল্লাহ
সম্পাদক
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১
রোল : ৬৩

"পরিসর স্বল্প দেখা সেও অল্প
এরই মাঝে এতো আয়োজন"।

ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করে তোলাই সাহিত্য। এই মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে করোনার ঝুঁকির মধ্যেও মুজিববর্ষে দক্ষিণবঙ্গের সেরা বিদ্যাপীঠ সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা'র ২০২০ এবং ২০২১ শিক্ষাবর্ষের জন্য মুজিববর্ষ স্মরণিকা "জ্যোতি" প্রকাশ হতে যাচ্ছে। যার একজন সদস্য হতে পেরে গর্বিত।

এ জন্য আমি প্রথমেই মহান ঈশ্বরের কাছে চির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম স্যারকে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ের দিক নির্দেশনাকারী অজয় কুমার সাহা স্যারকে। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই অন্যান্য শিক্ষকমণ্ডলি ও শিক্ষার্থী-প্রশিক্ষনার্থীদের যাদের ঐকান্তিক চেষ্টা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে মুজিববর্ষ স্মরণিকা "জ্যোতি" প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তির এই মাহেন্দ্রক্ষণে মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল শহিদদের আমার অন্তরের অন্তঃস্থল হতে শ্রদ্ধা সম্মান জানাচ্ছি। সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ খুলনায় কর্মরত সকলকে এই মহৎ উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্মৃতিকণা অধিকারী
সহ সম্পাদক
সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১
আইডি : ৮৫

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: এমএড, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	মোঃ সৈয়দ ফেরদৌস আলী	১৮/১, খালিশপুর, খুলনা	০১৭৩৫৩৫৩৫০৮
২	অপূর্ব সরকার	দিগরাজ, মোংলা, বাগেরহাট	০১৭১৮১৩৫১৪০
৩	মাহফুজা আনজুম	কুমারখালী, কুষ্টিয়া	০১৯২৭৪২০২৭৪
৪	সাবিনা	রহিতা, মনিরামপুর, যশোর	০১৭৩৮১৭৭৪৫৯
৫	কাজী কামরুল ইসলাম বিন ইদ্রিস	কাঠিয়া মেঠোপাড়া, সাতক্ষীরা	০১৬৭৪১৭২২১৯
৬	শাম্মী আক্তার	শিরোমনি, খুলনা	০১৭২২২১১৬২৭
৭	রুকাইয়া নাসরিন হায়াত	পাইকগাছা, খুলনা	০১৯১৩১২৩৮৫৪
৮	মোঃ ইমরান হোসেন	কচুয়া, যশোর	০১৭৭৭৯৮৭০১৬
৯	মোঃ ফরিদ হুসাইন	অভয়নগর, যশোর	০১৭১১৮৫২১৯৪
১৬	আবুল মোড়ল	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, খুলনা	
১২	রজনী খানম	রায়গ্রাম, লোহাগড়া, নড়াইল	০১৯৯১০২৬৪৭০
১১	লিমা মন্ডল	কাঠালতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা	০১৯৫০৭৮২৬৭৯
১৩	ওজিফা জান্নাত	পাহাটি, ঝিনাইদহ	০১৭৮২৩৫২৫৫৬
১০	পূজা দাশ	বেতাগা, ফকিরহাট, বাগেরহাট	০১৭৮৭১৮৭৫৩৬
১৪	মুসলিমা খাতুন	খানাবাড়ী, কুয়েট, খুলনা	০১৬৪৮৫০৩১৬৯
১৫	আয়শা খাতুন	বণিকপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯১০৩৩৪৪৫২
১৭	মোসাঃ নাসিমা খাতুন	তেলিগাতি, কুয়েট, খুলনা	০১৭৬৪৪৪৪৫৯৭
১৮	লাভলী নাসনিম	ইস্পাহানী, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	০১৬৭৯৫৩৩০৩৮
১৯	মোঃ রইসুল ইসলাম কচি	যোগীপোল, কুয়েট, খুলনা	০১৯৬৪৫৮২৬১৫
২০	মারজান ইসলাম বাবু	মিরেরডাঙ্গা, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯৪৯৬৩৫১৭৮
২১	তাসনিম রাব্বিনী অবন্তী	বেজপাড়া, যশোর	০১৯৯০৫৪৪২৬৮
২২	মোঃ সজল বিশ্বাস	ফুলবাড়ীগেট, কুয়েট, খুলনা	০১৭৬৭৬৮১৪৭৮
২৩	সিফাতুল্লাহ সগির	পিরোজপুর, বরিশাল	
২৪	মোঃ নাসিম উদ্দীন	খানপুর, মনিরামপুর, যশোর	০১৬৪৫৪৯৯১১৭
২৫	মোঃ বিপ্লব হাওলাদার	তেলিগাতি, কুয়েট, খুলনা	০১৯১০৬৭৭৬৭৫
২৬	পিংকি সরকার	গিলাতলা, খুলনা	০১৯৪০৯৭৪৫৪৫
২৭	মোঃ রাসেল খা	পূর্ব জয়দেবপুর, ঝালকাঠী	০১৬০১৭৪২২১৬
২৮	আছিয়া খাতুন	জামিরা, ফুলতলা, খুলনা	
২৯	পিকু বিশ্বাস	রংপুর, কালিবাটী, ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৬১২২১৩১০১
৩০	জয়ন্ত সরকার	দেবনগর, সাতক্ষীরা	০১৭৩৯১৩২২২৪

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: এমএড, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
৩১	নুসরাত জাহান নিশাত	রেলিগেট, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯৭৬৪৪৪৭৪৪
৩২	মোঃ সাইফুল ইসলাম	নোয়ালী, মনিরামপুর, যশোর	০১৭০৩০০৯৭৬১
৩৩	মোঃ শফিকুল ইসলাম	জাব্দীপুর, কুয়েট, খুলনা	০১৯৩৪৭১৫৪৩০
৩৪	আফিফা রহমান	খানাবাড়ী, কুয়েট, খুলনা	০১৫২১২৩৯৫৯০
৩৫	মনোয়ারা খাতুন	পায়গ্রাম, ফুলতলা, খুলনা	০১৭৯২৯৯৩০৯৯
৩৫	মনোয়ারা খাতুন	পায়গ্রাম, ফুলতলা, খুলনা	০১৭৯২৯৯৩০৯৯
৩৬	মুরাদ মোল্লা	কলাপাড়া, পটুয়াখালী	০১৬০৮৪৯৪৬৮৩
৩৭	মাজেদা খাতুন	কলাবগী, দাকোপ, খুলনা	০১৭৪১৭৪৫৭১০
৩৮	শেখ আতিকুর রহমান	শিরোমনি, খুলনা	০১৭৩৫৮০৩০৬২
৩৯	এসএম আবির হোসেন	ছোট গৌরীচন্দ্র, শ্যামহন, বরগুনা	০১৭০৫৫২২২২৩
৪০	হেমা কাবেরী	বরিশাল সদর, বরিশাল	০১৭১৪৭৩৭৮৫৯
৪১	ইমন হোসেন	সাহেবের হাওলা, বরগুনা	০১৭১০০৪০২০০
৪২	রতন মিস্ত্রী	কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	০১৭৫৩৪৩৩০৪১
৪৩	দেবব্রত ঢালী	বরিশাল সদর, বরিশাল	০১৭১৮১০০৩৩২
৪৪	সঞ্জয় গাইন	বরিশাল সদর, বরিশাল	০১৭৪৯৫৩১৮৪৮
৪৫	ফাতেমাতুজ জোহরা	বাদলপাড়া, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল	০১৭৮৪২২৩৬৭৩
৪৬	লামিয়া আক্তি	বরিশাল সদর, ররিশাল	০১৭৬০৯২৪০৫৬
৪৭	মোসাঃ ফরিদা খানম	কাশিপুর, বরিশাল	০১৭৭৫৫৭৪২৪৬
৪৮	তরিকুল ইসলাম	গুঠিয়া, উজিরপুর, বরিশাল	০১৮৭৫২৬২২৩০
৪৮	আখি আক্তার জান্নাত	কাশিপুর, বরিশাল	০১৭২৫০৪৯৬৩৬
৫০	মোসাঃ শাহিনা আক্তার	কাশিপুর চৌমাথা, বরিশাল	০১৭৯১৬০৪৪৩৪
৫১	সঞ্জয় চন্দ্র রায়	কাশিপুর, বরিশাল সদর, বরিশাল	০১৭৯৬২১১৯৫৮
৫২	মোঃ আতিকুর রহমান	বরিশাল সদর, বরিশাল	০১৮৩৬২৯৪৯৫০
৫৩	নাজনীন আক্তার	কাশিপুর, বরিশাল	০১৭৪৫২১২৪৬১
৫৪	মোঃ পারভেজ	উজিরপুর, বরিশাল	০১৬১১৪৩৫১০৪
৫৫	মোঃ আমিনুল ইসলাম	খানাবাড়ি, কুয়েট, খুলনা	০১৭৫৩১৬৬৬০১
৫৬	নিয়াজ মাহমুদ	বরিশাল সদর, বরিশাল	০১৭৮৯৬৯২৪০২
৫৭	সুমাইয়া খাতুন	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৫৫৮৮৪৩১৮
৫৮	সুজুমী আক্তার সুমি	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৫৪০৩৮১০৮

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: এমএড, ২০২০

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	ইয়ারুন্নেছা	গোটাপাড়া, বাগেরহাট	০১৯১৫৯৩২০০৭
২	চৈতালী বিশ্বাস	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৭২১৬৮৫৮২২
৩	কাজী আইনুন জারিয়া তাপসী	কাশেমনগর, গল্লামারী, খুলনা	০১৭১৮৮২৯৯৫৭
৪	জগন্নাথ দে	পাইকগাছা, খুলনা	০১৭৩৩৮৬০৪৬১
৫	মোঃ শফিকুল ইসলাম	কেশবপুর, যশোর	০১৯১৭৪২৬৩৬২
৬	শুভংকর হালদার	ফকিরহাট, বাগেরহাট	০১৭২৫৬১৩৪২২
৭	মুরছালিনা খানম	কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ	০১৭৬১৪২৪৭৯৪
৮	মোঃ মাহমুদুল হাসান	বটিয়াঘাটা, খুলনা	০১৯৬২০৫০১২১
৯	ফাতিমা আক্তার কলি	ফকিরহাট, বাগেরহাট	০১৮৫১৭৫৩১৬৭
১০	অনিতা দেবনাথ	চুলকাঠি, বাগেরহাট	০১৭১৭৫৮৩৯৩২
১১	হারুনার রশীদ	কেশবপুর, বাগেরহাট	০১৭৭৭১৫১৩৯৯
১২	সাকেরা খাতুন	নড়াইল সদর, নড়াইল	০১৭৩৭০৯০৩৯৫
১৩	শাহিনা আখতার	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৭১১৩৯১৮৯১
১৪	নয়ন কুমার মুখার্জী	পাইকগাছা, খুলনা	০১৯১২৭২০৪৬২
১৫	ফজিলাতুন্নেছা	খালিশপুর, খুলনা	০১৭২২২২৬৭০১
১৬	এস,এম সালাহউদ্দিন	দিঘলিয়া, খুলনা	০১৮৩৪২০১৩২৫
১৭	কামরুন নাহার	হাউজিং, খালিশপুর, খুলনা	০১৭১৮২৮৬২০০
১৮	মোহাম্মদ মীরাজুল ইসলাম	টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ	০১৭৫৬৩৯২৯৯০
১৯	মোঃ মাসুদ রানা	তালা, সাতক্ষীরা	০১৭২৫২৫৯৬৪৪
২০	মোঃ হাদিউজ্জামান	অভয়নগর, যশোর	০১৭১৭১২৭৫৮৮
২১	মোঃ মিজানুর রহমান	রামপাল, বাগেরহাট	০১৭১৫৫০৯০৪১
২২	মোঃ শাহনেওয়াজ করিম	রামপাল, বাগেরহাট	০১৭১০০০৩২৩২
২৩	নাহিদ আখতার ইভা	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, খুলনা	০১৭১২৬৭৪৩০৪
২৪	জুলেখা খাতুন	বাসাবাটি, বাগেরহাট	০১৭৯৮২৩৬৪১৬

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	রীতেশ রঞ্জন বিশ্বাস	শলুয়া বাজার, খুলনা	০১৭১৭২৮৪৪৪৫
২	শেখ মেহেদী হাসান সবুজ	পানিগাতী হাজীগ্রাম, দিঘলিয়া, খুলনা	০১৭৩৯৬৪৪০৬৩
৩	আলী মোহাম্মদ ফারুক	কে বাইনতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা	০১৯১৯২২৯৭৯৪
৪	বিধান কৃষ্ণ পান্ডে	এস, এম মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ	০১৭৩৬৮৭৫৫৫৪
৫	রজত দাস	এস এম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ	০১৫১৫২৫৮৭৬৬
৬	আজগর আলী	মাড়িয়ালা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা	০১৫১৫৬১১৫৫৮
৭	মোঃ গওহুল কবির	হঠাৎগঞ্জ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা	০১৭৯৯০৪৭৮৬৭
৮	অমিত রায়	পিঠাভোগ, আলাইপুর, রূপসা, খুলনা	০১৯৩০৩৪২৯৬৯
৯	শরিফুল ইসলাম	ঘুগরাকাটি, কয়রা, খুলনা	০১৪০৪০০৯৪৮৯
১০	মোঃ আলী সোহাল জুয়েল	ঘোষাল, গদাইপুর, পাইকগাছা, খুলনা	০১৯১৩৯৩৬৭৬৬
১১	মনোজ কান্তি রায়	আমতলা, বানি শান্তা দাকোপ, খুলনা	০১৮৪১০৬৩১২৪
১২	কাজী আজহারুল ইসলাম	সহকারী শিক্ষক (কম্পিঃ), ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি স্কুল, কুয়েট, খুলনা	০১৯২৩৮৭১৫২৫
১৩	সুমাইয়া আলম	৫৬, মিউনিসিপ্যাল, ট্রাংক রোড, খুলনা	০১৭৮২৬৬২৭০৫
১৪	নিবেদিতা মল্লিক	কোলন্দা, আশাশুনী, সাতক্ষীরা	০১৭১৪৫০৭৯৬১
১৫	মোঃ সাইফুল ইসলাম	খড়মখালী, চিতলমারী, বাগেরহাট	০১৯২৩০৬২২২৬
১৬	মোঃ রিয়াজুদ্দীন	টাউন নোয়াপাড়া, ফকিরহাট, বাগেরহাট	০১৬৮০৬০৭১৬৫
১৭	প্রশান্ত গাইন	নন্দনপ্রতাপ, দিঘলিয়া, খুলনা	০১৭৫৩৮০৪১৬১
১৮	মোঃ রুহুল আমিন মোড়ল	গাওঘরা, বটিয়াঘাটা, খুলনা	০১৯১১৮৪৭১৩১ ০১৭১২৪৫৪৬৯৮
১৯	শবনাজ পারভীন পিংকী	রাজনগর, কেশবপুর, যশোর	০১৭৫৭১৭৭৩০৯
২০	রাহুল দেব গাইন	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯২১৯৩৬৮৪৮
২১	দেবব্রত বিশ্বাস	বেদকাশী, কয়রা, খুলনা	০১৯৮৯৫৮৬৩৮৫
২২	মোঃ আছাবুর রহমান	গজেন্দ্রপুর, ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৯১৯৯৬৮২০১
২৩	মোঃ আবু জাফর	আজাদনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষরী	০১৭০৬৬৩৮৬৭৫
২৪	মোঃ ইমন খান	গোলনা, ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৬৪৭১৯০৩১৯
২৫	কৃষ্ণপদ বিশ্বাস	চাউলচুরী, মোল্লাহাট, বাগেরহাট	০১৭৪৭৫২৮০৬২

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
২৬	ঊর্মি অরুনা রায়	খুলনা শিপইয়ার্ড, খুলনা সদর, খুলনা	০১৭৩৮১০৪৭১০
২৭	এস.এম.নিয়ামুল ইসলাম	৪০/৮ (ক), খালিশপুর, খুলনা	০১৯১৪২২৬৪১৫
২৮	জেবুন্নেছা জেবু	৪০/৮ (ক), খালিশপুর, খুলনা	০১৯৫৭৬১৪৭১৪
২৯	এস.এম. নূরুল ইসলাম	বটিয়াঘাটা, খুলনা	০১৯২৮১৫২৩৫৬
৩০	শারমিন আক্তার	ভাষানী সড়ক, মোংলা, খুলনা	০১৯১৬১৩৮৯০২
৩১	জান্নাতারা খন্দকার	বেনেগাতী, আফরা, বাগেরহাট	০১৭৬৫২১১৪০২
৩২	মোঃ আবুল কালাম	মশিয়ালী দাখিল মাদ্রাসা, ফুলতলা, খুলনা	০১৯২৪৬৬৯৬৯২
৩৩	সুখেন্দু কুমার মন্ডল	পুইজালা, আশাশুনি, সাতক্ষীরা	০১৯৬৪৯৪০৬২৮
৩৪	তমা কর্মকার	মুনজিতপুর, সাতক্ষীরা	০১৯১২২৪৯২৩৮
৩৫	উম্মে মাহমুদা তুলি	৪৪, ফারাজিপাড়া মেইন রোড, খুলনা	০১৭১৯৯৬৮৩৩৪
৩৬	দেবদাস ঢালী	বড়দল, আশাশুনি, সাতক্ষীরা	০১৯১৪২৭৫৯৯৮
৩৭	শারমিন সুলতানা অন্তু	৪৪, ফারাজিপাড়া মেইন রোড, খুলনা	০১৭২১২০২১৪১
৩৮	মোঃ মনিরুল ইসলাম	কলবাড়ী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৭২৫৬১৪২৪০
৩৯	মোঃ আবু হানিফ	শংকরপাশা, অভয়নগর, যশোর	০১৭২০৪৪৯৪৪৪
৪০	মোঃ জিলান খান	নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর	০১৯২০১৩৮১৬২
৪১	মোঃ তৌফিক আলম	পাঁচারই, বড়েঙ্গা, কেশবপুর, যশোর	০১৭১২৯৮৮২১১
৪২	জি.এম. আবু মুসা	কাপালীডাংগা, ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৭৯১১৬৪৬৪৮
৪৩	মোঃ আলমগীর হোসাইন	ধামালিয়া, ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৯৪৩৫২২৭৩৯
৪৪	ফারজানা আক্তার	চন্দনীমহল, দিঘলিয়া, খুলনা	০১৮২৭৯০০৬৯৪
৪৫	নিলুফা ইয়াসমিন	৩৩৮/৩, খালিশপুর, খুলনা	০১৬৭৩০৪৫৫৫৯
৪৬	ইমা খাতুন	উত্তর কারিকরপাড়া, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯৮২৪৫৫৭৬৫
৪৭	সন্তোষ কুমার মন্ডল	পোড়াকাটলা দীপায়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৮৮৫৪৪০৮৩৪
৪৮	প্রনোজিত মন্ডল	বাঁশখালী, শরিষামুট, কয়রা, খুলনা	০১৯১৮৮১৫৬৪৬
৪৯	নিউটন হালদার	জামিরা বাজার, অভয়নগর, যশোর	০১৭১৪৯৩৪৬২৮
৫০	হৈমন্তী রাজবংশী	জামিরা বাজার, অভয়নগর, যশোর	০১৭৪৪৬৫০০৩২
৫১	রাবেয়া খাতুন	আল-আমীন মহল্লা, বানরগাতী, খুলনা	০১৭২০০১৬৫০৭
৫২	অনিমা রপ্তান	দৌলতপুর, খুলনা	০১৯৯৬১৯০৭৯৫
৫৩	চুমকি ঘোষাল	দিগরাজ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোংলা, বাগেরহাট	০১৯১৫০৯৬৬৪৭

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
৫৪	দীপংকর রায়	লাউডোব, দাকোপ, খুলনা	০১৯১৪৭২২২১৬
৫৫	পবিত্র কুমার মন্ডল	ধূমঘাট, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯২৮২৮৯৯৮৩
৫৬	মোঃ সাজ্জাদ হুসাইন	কালিয়া, নড়াইল	০১৯৬১১২৪২৪০
৫৭	শামীমা সুলতানা	উইলসন রোড বন্দর, নারায়নগঞ্জ	০১৭১২৮৬২৪২৪
৫৮	ফারাহ সুলতানা	১৬৬ মধ্যডাঙ্গা, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯০৩১১৩৭৩৮
৫৯	মোঃ মিকাঈল হোসেন	২১৪, কাজী মঞ্জিল, খুলনা	০১৭৩৬৪২৬২০১
৬০	মোঃ মিরাজ সরদার	হরিঢালী, পাইকগাছা, খুলনা	০১৯২৫৫৪৬৬২০
৬১	মোঃ মনিরুল ইসলাম	সাতানী, বাঁশদহা, সাতক্ষীরা	০১৯৪৯৮৮০১১৩
৬২	মোঃ শফিকুল ইসলাম	কুলিয়াডাঙ্গা, বাঁশদহ, সাতক্ষীরা	০১৭৪১৩০২৪০৫
৬৩	খালিদ সাইফুল্লাহ	রামনগর, রহিমনগর, রূপসা, খুলনা	০১৯৫৫৮০৪৬৬৬
৬৪	মোঃ মোর্ত্তজা রহমান	বানরগাতী, সোনাডাঙ্গা, খুলনা	০১৯২২১৪৫৯৯৯
৬৫	বিশ্বজিৎ কুমার মন্ডল	ত্রিপানী বিদ্যাপীঠ, মুন্সিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৭২২৪৫২৪৩০
৬৬	মোঃ সুমন হোসেন	সকিনা আজহার টেঃ কলেজ, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৯২৫৫৮৬০০৪
৬৭	শুভ্রা ঠাকুর	২৯৪, জনতা রোড, গোপালগঞ্জ	০১৬৮৯৩১৮৮৪৮
৬৮	যুথিকা সরকার	দোলখোলা, শীতলা বাড়ী, খুলনা	০১৭৫৮৯৯৫২৮৮
৬৯	নাজমিন নাহার	কলেজপাড়া, কেশবপুর, যশোর	০১৯৩৭৭৪৮২০৪
৭০	মোঃ আব্দুর রহিম	সেন্ট জোর্ভিয়াস হাই স্কুল, সোনাডাঙ্গা, খুলনা	০১৯২১১৫৬২৭৭
৭১	এম.এম. নুরুন্নবী	চাঁদেরহাট মাঃ বালিকা বিদ্যাঃ, মোল্লাহাট, বাগেরহাট	০১৭৫২৬৩৮০৩৬
৭২	রবীন্দ্র নাথ মন্ডল	দাসপাড়া, বড় বয়রা, খালিশপুর, খুলনা	০১৭৪৬৯৪০০৪৪
৭৩	সিদ্ধার্থ শংকর মজুমদার	বিশ্বতক মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, রামপাল, বাগেরহাট	০১৭৫৩০১৯০৮৭
৭৪	নৃপম মন্ডল	তেরখাদা, খুলনা	০১৯১৮৬০৩৭৬৫
৭৫	মোঃ ওলিয়ার রহমান	অভয়নগর, যশোর	০১৯৩৭৫০৫৩৮৩
৭৭	মোঃ আসাদুজ্জামান	বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা	০১৭৬৬৩৩৫২১৫
৭৮	শেফালী খাতুন	বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা	০১৭৭৯৮৭৩৬০৩
৭৯	এম, এম মারিউর রহমান	বরুনা, ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৭১২৯৩৯৩৭৯
৮০	সালেহা পারভীন	বরুনা, ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৭১২৩০৮৪১৯
৮১	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৭১২৩৮৮৬৩৮
৮২	কামনা বিশ্বাস	কেশবপুর, যশোর	০১৭৬৮৫০১৬৬০

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
৮৩	তাবারাকা	১৭১, সিদ্দিকীয়া মহল্লা, খুলনা	০১৯৫২৪৭৫২৭৫
৮৪	শারমিন ফেরদৌসী	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা	০১৯১৩৭২৯০১৪
৮৫	স্মৃতিকণা অধিকারী	মোল্লাহাট, বাগেরহাট	০১৭৫৪৬৫৩১৫৬
৮৬	আহসান উল্লাহ	কয়রা, খুলনা	০১৯৫৬৯৮০১৮১
৮৭	জাকিয়া সুলতানা	আঞ্জুমান রোড, দৌলতপুর, খুলনা	০১৭৩৬০১২৯৪৭
৮৮	হাজেরা খাতুন	যাদবপুর দাখিল মাদ্রাসা, নড়াইল	০১৯১০০৯০৪৭২
৮৯	মোছাঃ পিয়ারা কলি	মৌতলা সিদ্দীকিয়া দাখিল মাদ্রাসা, সাতক্ষীরা	০১৯১১০১৩৩৩৬
৯০	প্রিয়াংকা সাহা	৪, তাজ হাউজ, শিববাড়ি	০১৬৪০২৩৩২১৩
৯১	নওশিন ফারজানা সিলভী	দৌলতপুর, খুলনা	০১৯১৫৫১৬৯৩৬
৯২	শারমিন আক্তার	অভয়নগর, যশোর	০১৭২০-৩০৬১৫৭
৯৩	আইরিন ফারহানা	গাজিপুর রউফিয়া কামিল মাদ্রাসা, অভয়নগর	০১৭২৬৭২৮৬৪৬
৯৪	সুপ্তি মন্ডল	হাসপাতাল রোড, পাইকগাছা, খুলনা	০১৭৯১১৬৫৫০০
৯৫	এস,এম তৈয়েবুর রহমান	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	০১৭৩৫৮৫৮৪৩৪
৯৬	চন্দনা রানী শীল	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	০১৭২০৫৯৬৩৭৫
৯৭	মোঃ ইদ্রিস সরদার	টিকারামপুর, তালা, সাতক্ষীরা	০১৭৩৮৩১২২৪৬
৯৮	গোপাল কৃষ্ণ শীল	খালিশপুর, খুলনা	০১৭৯৩৬৫২৭৮৫
৯৯	মোঃ তহিদুল ইসলাম	বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বাগেরহাট	০১৭১৯০১৫০৫৪
১০০	ইসমত আরা সাথী	শিরোমনি, খানজাহান আলী, খুলনা	০১৭৪৫৬৩৪৬৮৪
১০১	মোঃ গোলাম মোর্শেদা	৯৩/১, মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯৬৩৯৯৪৭৩৬
১০২	দিপা রানী বিশ্বাস	নিরালা, খুলনা	০১৭৭০৮৮৩১৪৪
১০৩	পূজা পাল	মধিবাড়ীয়া, কালিয়া, নড়াইল	০১৮২৬০৪৮২২৩
১০৪	খাদিজা পারভীন	কপালিয়া, মনিরামপুর, যশোর	০১৯৬৩৫৯৪৯৯৬

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২০

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	সালাউদ্দিন	পাংশা, রাজবাড়ী	০১৭০৩৭৮৫৩১৩
২	মোঃ রবিউল ইসলাম	মনিরামপুর, যশোর	০১৭২২৯৮৫৪১৪
৩	সুমন কুমার সরকার	মালঞ্চী, যশোর	০১৭৭৯৪১২০৮০
৪	মোঃ হেদায়েতুল্লাহ	গোবরদাড়ী, সাতক্ষীরা	০১৭৩৩১৬৪০৪৩
৫	মোঃ আব্দুর রহমান	আশাশুনী, সাতক্ষীরা	০১৯১১৮৮০১৮৬
৬	মোঃ আসলাম আলী মেহেদী	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৯২৩০৭৫৯২০
৭	খান তানজিম আফরোজ	ফকিরহাট, বাগেরহাট	০১৭২২২১২০১৯
৮	মোঃ রকিব উদ্দিন	মনিরামপুর, যশোর	০১৭২৩৯৭৬১৪৭
৯	ওবায়দুর রহমান	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৭১৯৪২২১৩৯
১০	মোছাঃ শামসুন্নাহার	হরিপুর, ঝিনাইদহ	০১৯৩৬৯২৮৮৯৪
১১	শেখ মাহবুবুর রহমান	মোল্লাহাট, বাগেরহাট	০১৯১০৬৩৭৫৯৫
১২	মোফাজ্জেল খান	বটিয়াঘাটা, খুলনা	০১৯২৩৯৮৪১১২
১৩	মোঃ আব্দুল মমিন	বয়রা, খুলনা	০১৬৭২২৯৪২১৭
১৪	শারমিন শম্পা	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, খুলনা	০১৯২৬৭৭৬৪৯৬
১৫	হানিফ বাওয়ালী	চিতলমারী, বাগেরহাট	০১৯২৩৩২৮১২৯
১৬	রেজাউল ইসলাম	মহেশপুর, ঝিনাইদহ	০১৯২৩৭৯৬৮২৬
১৭	মোঃ শাহাদাৎ হোসেন	কলারোয়া, সাতক্ষীরা	০১৭৪৬১৯৮৬৪৪
১৮	ফারজানা সুলতানা	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	০১৩০৭৯৫০৬৭৫
১৯	সোনিয়া আক্তার	মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট	০১৯৫০১১৫৯৭৪
২০	মোঃ রিয়াজুল ইসলাম	পাবলা, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯২৩০৮০০৮২
২১	মোঃ শেখ সোহেল রানা	তেরখাদা, খুলনা	০১৯২১১০৮৪৭১
২২	মোঃ নাহিদ হাসান	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৭১৯৫৮১৪২৫
২৩	দেবব্রত মন্ডল	কয়রা, খুলনা	০১৭৪৭১০৮৯০৪
২৪	অসীম কুমার দাস	দাকোপ, খুলনা	০১৯২২৩৬০৪০১
২৫	মোঃ রেজাউল হোসেন	বাঘারপাড়া, যশোর	০১৭৯০১৩৯৪৪৫
২৬	শেখ শরিফুল ইসলাম	ভট্টপ্রতাপ, বাগেরহাট	০১৭১৮৩৪৮২০২
২৭	মোসাঃ সুরাইয়া জাহান	গোকুল, রাজশাহী	০১৭১৯৩৬৩৮৮৩
২৮	মাহবুবা সুলতানা	দামোদর, ফুলতলা, খুলনা	০১৯২২৬১৭২৭৫
২৯	পলাশ মন্ডল	কাজুলীয়া, গোপালগঞ্জ	০১৭৭৬০১৪৭৮২
৩০	নুসরাত জাহান	বোয়ালমারী, ফরিদপুর	০১৮৪৫৫৪৪১২২
৩১	সালাউদ্দিন ইউসুফ	পাইকগাছা, খুলনা	০১৭৯৭০৮০৬৮৪
৩২	ইন্দ্রা রানী ঘোষ	বটিয়াঘাটা, খুলনা	০১৭১৮৪৭২১৬৫
৩৩	ফাতেমা খাতুন	বাগমারা, খুলনা	০১৯২১৯৪৮৯১০

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২০

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
৩৪	সেলিনা খাতুন	কেশবপুর, যশোর	০১৭৬৬৮৮৬৬৬৯
৩৫	মুহাম্মদ সাদ্দাম হুসাইন	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৭৫১৭২১০৬২
৩৬	অঞ্জলী মল্লিক	মনিরামপুর, যশোর	০১৭০৩৮০৮৯০৯
৩৭	সাইফা আলম	রায়পাড়া মেইন রোড, খুলনা	০১৭৫৮৮৩৮৩৩১
৩৮	মোঃ আঃ রহিম	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯৩৪২৪৮৯৩৫
৩৯	মল্লিকা রানী বৈরাগী	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৯২৭৭৯৫৪৭৭
৪০	আব্দুল হামিদ	মহেশপুর, ঝিনাইদহ	০১৯৩৫৫৮৯৫৭৯
৪১	অলোকা বিশ্বাস	তেরখাদা, খুলনা	০১৯১৪১৩৬২১৫
৪২	মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা	চন্দনপাট, রংপুর	০১৭২২৮০৭৪৮২
৪৩	উজ্জল কুমার দাস	বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট	০১৭১৬২৯৭০০২
৪৪	নুসরাত জাহান	মোংলা, বাগেরহাট	০১৬৮৪৯০৩৩৮৬
৪৫	মোঃ সাইদুজ্জামান	কেশবপুর, যশোর	০১৭৩৭৯৫৬৭৪২
৪৬	আব্দুল্লাহ আল মামুন	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৯২৮৮৪০৮৮৫
৪৭	আমেনা আক্তার	শরনখোলা, বাগেরহাট	০১৭১৯৭৪৪৬৬০
৪৮	সুমাইয়া আফরিন	দৈবজ্ঞহাটি, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট	০১৭২৫০৮২৮৯৯
৪৯	মনি মালা মন্ডল	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৯১২৫৯০২৯৫
৫০	আয়শা ছিদ্দিকা	সেনহাটী, দিঘলিয়া, খুলনা	০১৯১৯১১৩৩৫৬
৫১	কৃষ্ণানু গোলদার	দিঘলিয়া, খুলনা	০১৭৬৪৫৪১০৬২
৫২	আমেনা আক্তার	রাজৈর, মাদারীপুর	০১৭২০৮১০৯১২
৫৩	শারমিন আক্তার (বৃষ্টি)	হাউজিং এষ্টেট, খালিশপুর, খুলনা	০১৬২৯৪৬৩০৩৪
৫৪	মোঃ শাহিনুর রহমান	আশাশুনি, সাতক্ষীরা	০১৭১৯২৭৩৭১৬
৫৫	মোঃ সাইফুল আলম	কাটিয়া, সাতক্ষীরা	০১৭১৫৭১২৯৮৪
৫৬	অসীম মন্ডল	গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ	০১৭২৩৩২৪৬১৪
৫৭	মোঃ শামীম হোসাইন	পশ্চিম টুটপাড়া, খুলনা	০১৯২০২৩৪৩৫৮
৫৮	মোঃ টিপু সুলতান	তেলিগাতি, খুলনা	০১৯৪৩৫২৫১০৭
৫৯	ফাতেমা সুলতানা লিমা	মোংলা, বাগেরহাট	০১৬৮৩৭৫১৪৭৫
৬০	পিংকী মৃধা	মোহাম্মদপুর, মাগুরা	০১৬৪৫৫৬৪৭০১
৬১	মোঃ শিবলী নোমানী	টুটপাড়া, খুলনা	০১৭৯০২০৪৫২০
৬২	মেহেদী হাসান	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	০১৯৪৫৫২৭০০৫
৬৩	তাসলিমা আক্তার	সূত্রাপুর, ঢাকা দক্ষিণ	০১৯৮৬৭২৯৮০৮
৬৪	সম্পা সাধু	পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা	০১৭৩৭১১৩৬৩৬
৬৫	সঞ্চিতা রানী কর্মকার	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	০১৭১৬৩৯৮৬৬৬

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২০

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
৬৬	মোসাঃ আক্তারী খাতুন	আশাশুনী, সাতক্ষীরা	০১৬৪২৬৬২২৬৮
৬৭	ফারহানা ইসলাম	জাহিদুর রহমান সড়ক, খুলনা	০১৭১০২৪০৯৮৪
৬৮	মরিয়ম খাতুন	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৯৮১২৯০১৮২
৬৯	মোঃ আল আমিন	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, খুলনা	০১৭৩১৬০১২১৮
৭০	ফারহানা আক্তার	তালা, সাতক্ষীরা	০১৭৬৩৭০৬২৫৮
৭১	হালিমা খাতুন	রাংদিয়া, বাগেরহাট	০১৭২২৯০৫৪৭৫
৭২	মোঃ আব্দুল করিম	বয়রা, খুলনা	০১৯৬১৬২৩৩৯০
৭৩	কৃষ্ণপদ মন্ডল	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৮১১৩৩৭৭৫৫
৭৪	রাজিব কুমার সমাদ্দার	শরনখোলা, বাগেরহাট	০১৭৭৫৯৮৭৯৪৭
৭৫	কাজল কুমার মন্ডল	দাকোপ, খুলনা	০১৯১৫৯৬১৬৩৭
৭৬	রিনা প্রভা দেউরী	তালা, সাতক্ষীরা	০১৯১৮২২৩৩৩০
৭৭	ইমদাদুল হক	তালা, সাতক্ষীরা	০১৭৩৬৮২৮৩২২
৭৮	নুসরাত জাহান শান্তা	রূপসা, খুলনা	০১৬৭৭৩৯৪৮৪৬
৭৯	অপর্না রায়	দাকোপ, খুলনা	০১৯৩৪২৫৭৮৫৭
৮০	কৌশিক মন্ডল	দাকোপ, খুলনা	০১৯১১০৭৫০৩৯
৮১	মিঠুন সরকার	দাকোপ, খুলনা	০১৯১৬৪৯০৭৪২
৮২	মোছাঃ লতিফাতুল ফারিহা	মোংলা, বাগেরহাট	০১৭৯১১৬১০১৬
৮৩	নুসরাত জাহান	দিঘলিয়া, খুলনা	০১৯৪২৩৫৯৩০০
৮৪	মোঃ আহসান হাবিব	দাকোপ, খুলনা	০১৯১১২৭১৮৮৮
৮৫	মোঃ আল আমীন	মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট	০১৭৫১৩৭৭০৫২
৮৬	ভৈরবী সরকার	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	০১৭৫৬৪৪৬৭৪৩
৮৭	সুরজিত কুমার মন্ডল	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯১১০৯২৩০৬
৮৮	বিনয় কুমার মন্ডল	শ্যামনর, সাতক্ষীরা	০১৯১১৮৬৬২২১
৮৯	জোবাইদা গাজী	শেখ পাড়া, খুলনা	০১৯১৮৯৩২২৫৫
৯০	রোজিনা আক্তার	নাজিরঘাট, খুলনা	০১৭৯৪০৭১৬৭০
৯১	ফারজানা ইয়াসমিন	কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৭৮৪৭৩৯৪৩৪
৯২	আলেয়া খাতুন	অভয়নগর, যশোর	০১৯৮৮৯৬৭২৪৭
৯৩	আল-আমিন শেখ	রামপাল, বাগেরহাট	০১৯৪৪৮৩৫৪৫৮
৯৪	দিবাকর মন্ডল	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৭৪৭৩২৭৬০৬
৯৫	মোঃ আলী মূর্তজা	মহেশপুর, ঝিনাইদহ	০১৭১৯৪৫৬০৩৬
৯৬	শশাঙ্ক কুমার রপ্তান	শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৭১৪৮৪৮৭৯৭
৯৭	মোঃ আবুল কাশেম	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৮৬৪১৫৪১০৩
৯৮	বিউটি রত্না	খালিশপুর, খুলনা	০১৭২৬৩৪৪২৫৭

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড, ২০২০

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
৯৯	সোহেলী পারভীন	আড়ংঘাটা, খুলনা	০১৫৫৮৩৪৩০৮৩
১০০	নাসিমা খাতুন	নিয়ামতপুর, নওগা	০১৭৯৬৮৮২৩৮২
১০১	মোঃ নজরুল ইসলাম	মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট	০১৯১৪৯৮৬৯৬৯
১০২	ফারজানা ইয়াসমিন	রামপাল, বাগেরহাট	০১৭৮২০৩৩৩৫১
১০৩	নাজমা সুলতানা	তালা, সাক্ষীরা	০১৭৯৫৬০৫৫৬৭
১০৪	জিএম রায়হান মাসুদ রাসেল	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৭৩০৬২৮৬৬৮
১০৫	আরিফা খাতুন	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, খুলনা	০১৯২০১১১৩৯০
১০৬	গোলক চন্দ্র মন্ডল	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৭৩৪৮০০২১১
১০৭	মনিরা পারভীন	শিরোমনি, খুলনা	০১৯৪৪৯৭২৩১১
১০৮	মোঃ আল শাহারিয়া ইমন	পাইকগাছা, খুলনা	০১৯৪০৫১৩৩৫৮
১০৯	মোঃ হাফিজুর রহমান	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৭৩৭২০৭৯০৭
১১০	মোঃ রুহুল আমীন	কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা	০১৯১২৫৪২৬৬২
১১১	অনির্বান বৈদ্য	দৌলতপুর, খুলনা	০১৭১১১২৪৯৬৩
১১২	মহাসিনা খাতুন	ফুলতলা, খুলনা	০১৯৬২০১২১১২
১১৩	হালিমা খাতুন মিমি	শিরোমনি, খুলনা	০১৯১৭৮৮৮৭৯২

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড অনার্স, প্রথম সেমিষ্টার (নতুন)

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	মোঃ নাহিদ হাসান		০১৭৮৮১২৫৯৭৩
২	জান্নাতুল মীম লাবন্য		০১৯৮৯৪১৫০৬৮
৩	মোসাঃ ফাহিমা আক্তার শান্ত		০১৯১৫৯৬৬৭৩০
৪	আফরিন সুলতানা মীম	ল্যাবরেটরি মোড়, কুয়েট, খুলনা	০১৯২৮৬৭০০১৭
৫	ইমরান ফয়সাল নাঈম	কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা	০১৯৫৬৬৩৮১৪০
৬	মোঃ আসাদুজ্জামান নাঈম		০১৬৪২৬৬২৩৯৮
৭	রোকেয়া ফেরদৌস		০১৯৫৩৯৮৩৩৮০
৮	রোকেয়া ফেরদৌস		০১৯৫৩৯৮৩৩৮০
৯	মোঃ ইমন হোসেন		০১৯০৩৪৬৩১৭২
১০	সাবিহা তাসনিম রাখী		০১৭৩১১৮৭৮১১
১১	সায়মা আক্তার	টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ	০১৯১১৬৫৩৫৬৪
১২	রিয়া খাতুন	তেলিগাতী, আড়ংঘাটা, কুয়েট, খুলনা	০১৯১৫৮৬১২৮৬
১৩	মোসাঃ সুমাইয়া আক্তার	জাব্দীপুর, খানজাহান আলী, খুলনা	০১৯৯৬১৯৭১২২
১৪	সামিয়া জাহান মুক্তি	তৈয়েবা কলোনী, খালিশপুর, খুলনা	০১৭৩৭২৬৬৬৯৬
১৫	সোবাহান শাহ পায়েল		০১৯১১৭৮১২৮৬
১৬	জান্নাতুল ফেরদৌস		০১৪০৪৩৬৭০৫৮
১৭	নুরুন্নাহার	ছোট ছলিমপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা	০১৭৬৪২৪৫৩৫৭
১৮	মিহির দাস		০১৯৫৪০৩৬৩১০
১৯	ওমর ফারুক	জাব্দিপুর, দিঘলিয়া, খুলনা	০১৪০৩৬৪৬২০৭
২০	রায়েশা খাতুন		০১৮১৭৫৫০২০৪
২১	লোপা খাতুন		০১৩১৪৫৮৮০৭৬
২২	আরিফুল ইসলাম	ওমরপুর, তালা, সাতক্ষীরা	০১৭৯০৮৪৮৭৪৬
২৩	লামিয়া ইসলাম রিয়া		০১৯১৪৮৮৮১২২
২৪	সাইদা আখি		০১৯৯৫১৪৬৭৮১
২৫	সাহেদ বিন জাহিদ	মহেশ্বরপাশা, বুচিতলা, কুয়েট, খুলনা	০১৭৭৮৫৪৮৬৮০
২৬	সুজন হোসেন		০১৮৬২০৫২১২৪
২৭	তিথী আক্তার		০১৯৯৮৭১১০৪৮
২৮	মোঃ আবু হামজা খান		০১৮৫৯১৯০১৩৭
২৯	মাহফুজ জামান	যোগীপোল, খানজাহান আলী, খুলনা	০১৮৯০২০৪৮৯২
৩০	রেজওয়ান খান বাধন	ল্যাব মোড়, কুয়েট, খুলনা	০১৭১১০০০০৩১
৩১	মাসুরা সানজানা		০১৯৬০৩৯৩৭৭৭
৩২	শতাব্দি মন্ডল		০১৬৩৭৭৩৯৫৮৬
৩৩	তাপস কুমার দত্ত	তালতলা, আলাইপুর, রূপসা	০১৯০৪৯১৮৭৩০
৩৪	আসাদ আল রাফি		০১৯১২৮১৪৬৪৮
৩৫	এস এম মাজহারুল ইসলাম		০১৫৬৭৮৫৫৯৭৫
৩৬	রাকিবুল ইসলাম		০১৭৮৯৩৫৩০৪৮
৩৭	এস, এম, মাহবুবুর রহমান	বৃত্তিবারীপোতা, যাদবপুর, যশোর	০১৯৯৬৩১৬০৮১
৩৮	ধ্রুব মিশ্র	পাঁচানী, আলাইপুর, রূপসা, নাগদিয়া	০১৮৬৩৫৬০৭২৮
৩৯	হৃদয় মিত্র	তালতলা, আলাইপুর, রূপসা	০১৯৯২৩০৭১৫৩
৪০	নওশীন তাবাচ্ছুম প্রভা		০১৯০৩৭৬৮২৭০
৪১	জুম্মাতুল জোহরা আঁখি	তালা, সাতক্ষীরা	০১৯৬০৬৫৭৬২১

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড অনার্স, প্রথম সেমিস্টার (পুরাতন)

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	পাপ্পু সাহা		০১৭৩৬৫৩৩৬৪৪
২	ফাহিম মোর্শেদ চৌধুরী		০১৭২৮৭৩১১৮৩
৩	মোঃ অহিদুল ইসলাম	ফুলতলা, খুলনা	০১৯৪৯২৩৭০১৬
৪	মীর মোঃ শামীম হাসান	গোপালগঞ্জ	০১৯১৫৮১৫১৩৮
৫	আঁখি খাতুন		০১৬২৫৯৭৬৯৮৮
৬	তনুশ্রী রায়		০১৯১৮৬০৫১৬৫
৭	মেহেনাজ রহমান হিমু		০১৭১৭২৪৯৭০১
৮	সানজিদা জাহান তামান্না		০১৬২৮২৮৭২৪২
৯	হাফছা খাতুন		০১৯৮০০৭৫৩৬৬
১০	প্রিয়াংকা সানা		০১৯৪২৮৮০১৯৩
১১	শেখ রাসেল		০১৭৮৩৬০২৮১৬
১২	আখি বাড়ই		০১৯১১০৪২৪৩৮
১৩	তুষার ভক্ত		০১৭৭৭৯৩৮৭৩৮
১৪	নাইমুল হাসান	খানাবাড়ি, কুয়েট, খুলনা	০১৫৮৫২১৪৪৫৪
১৫			
১৬	উম্মে হাফসা		০১৯৫৪০০২৩২৬
১৭	মোঃ মাসুদ হোসেন	মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯২৯০৩৯৪৪২
১৮	মোঃ মেহেদি হোসেন		০১৯৫৪৪৪৩৬৭২
১৯	মোঃ আশিকুজ্জামান	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৬৫৫৪৪৬৮২
২৪	চৈতী রায়		০১৭৯৬৪৯৭৭৮২
২৫	মোহনা ইসলাম মিন্নি		০১৯৫২৪৪০২৬৩
২৬	ফারহানা আক্তার		০১৭১৬৮৮৭৬১১
২৭	মোঃ সজিব	খানাবাড়ি, কুয়েট, খুলনা	০১৬৩২৪৯৯৩০২
২৮	মোসাঃ তামান্না সুলতানা		০১৯৮৯২২৩০৪১
৩০	ইসরাত যাহরা		০১৭৭৫৬৩৬৪২১
৩১	সিফাত জাহান জিদনী		০১৯১২৩৭৮৯৫৫
৩২	মোঃ আবু রায়হান		০১৭৪৬৬৯৫২০২
৩৩	আরিফুল ইসলাম		০১৯১৪৫০৯১৭২
৩৫	ইশরাত জাহান ভাবনা		০১৯৯৩৮৬১৪১৬
৩৬	ঋতু বিশ্বাস		০১৬৩৩৩২৯৯০১

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড অনার্স, তৃতীয় সেমিস্টার, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	ঋতু রানী ঘরামী	গড়ঘাটা, ষোলশত, নাজিরপুর, পিরোজপুর	০১৭৫৯০৯৬৩১০
২	সুব্রত মন্ডল	জেলেখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৯৮২৬৭৯৩২৫
৩	মোসাঃ তাহেরা আক্তার	কাউখালী, পিরোজপুর	০১৭১৬১৮০৯৩৭
৪	মেহেদী ফরিদ	কলাবাড়িয়া, কালিয়া, নড়াইল	০১৯০২৬২৪৫২৬
৫	টনিশ ঢালী	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৭৫২৮৩৪৫২৪
৬	মধুশ্রী মন্ডল	মঠবাটী, গদাইপুর, পাইকগাছা, খুলনা	০১৯১৩১২৬০২৬
৭	কারিমা কওছার	যোগীপোল, শিরোমনি, কুয়েট, খুলনা	০১৯১৫৮৮৫০৬৩
১০	পপি খানম	কালিয়া, নড়াইল	০১৯৯৩৭৮৭৪২৯
১২	রেজওয়ান পারভেজ	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯৮৯৬২১৭৮১
১৩	হুমায়রা সিদ্দিকা	শিরোমনি, ফুলতলা, খুলনা	০১৯৬৪৫৮৩৪৯০
১৫	মোঃ আশরাফুল হক	সোনাতুলি, কাউখালী, ফরিদপুর	০১৭৪৬০৪১১৩১
১৬	সাওদা হাবিবা	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৭৭৬৬৩৪৮০৪
১৭	মোঃ সামিরুল ইসলাম	মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, কুয়েট, খুলনা	০১৬৩২৭৭৯১৪৮
১৮	সৈয়দ নাছিম আহম্মেদ আনিকা	মহেশ্বরপাশা, দৌলতপুর, খুলনা	০১৮৪৯৫৮২৮৬১
১৯	জলি খাতুন		০১৯৬৯৭৯৬১২৫
২০	তরিকুল ইসলাম তানিম	খালিশপুর, খুলনা	০১৯৮০৪৫২৪২৯
২২	কলম চাকমা		০১৫৩৩৯৫৫৯৭৪
২৩	মোঃ হেলাল উদ্দিন	সাতক্ষীরা	০১৯৮৫৪০৯৪০১
২৪	রেশমা খানম		০১৯১৩৭৫৬৭৫৮

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড অনার্স, পঞ্চম সেমিস্টার, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
২	মোঃ রবিউল ইসলাম	বাকেরগঞ্জ, বরিশাল	০১৭৫১০৯৮৮৩৯
৩	নুসরাত জাহান তামান্না	তেলিগাতী, কুয়েট, দিঘলিয়া, খুলনা	০১৭৭৭৬৮০৭৬৯
৪	সুরাইয়া ইয়াসমিন প্রিয়া		০১৯০৪১৩৬৫২২
৫	তুলি খাতুন		০১৯৮৫৫৬২০২৩
৬	ফাতিমা বুশরা	বানরগাতী, সোনাডাঙ্গা, খুলনা	০১৫২১৪৫৪৫৭২
৯	সুদর্শন মন্ডল	বাশখালী, শৈলখালী, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা	০১৭১০২২২১১৪
১০	রায়হান সরদার	খলিশাখালী, তালা সাতক্ষীরা	০১৭৯৩২২৮৭৪৯
১১	মোস্তাকিমুন্নাহার বৃষ্টি	পানিঘাটা, মোহাম্মদপুর, মাগুরা	০১৯৭৪৭৭৫৯৯৫
১২	মোঃ সোহান গাজী	খর্ণী, ডুমুরিয়া, খুলনা	
১৩	কেয়া আক্তার	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৭৪২৯৭৬২০৪
১৪	রাজেস মন্ডল	হরিণটানা, কৈলাশগঞ্জ, দাকোপ, খুলনা	০১৯৮৩১০৮৪৭৯
১৫	আসমা আক্তার		০১৩০৮২৯৭৫৪৫
১৭	অদিতি তানিয়া	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৭২৩১১৩৭৩৪
১৯	রুবাইয়া রহমান ঝুমু	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, খুলনা	০১৩০৮২৯৭৫৪৫
২২	শারমিন আক্তার সাথী	খানাবাড়ী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৫৫৯১৭৩৭২
২৩	ফারজানা ইয়াসমিন মিমি	জাব্দীপুর, কুয়েট, দিঘলিয়া, খুলনা	০১৯২৮২৯২৫৯৯
২৪	সোহানুর রহমান	ল্যাবঃ মোড়, কুয়েট, খুলনা	০১৯৫০৫৬৭৫৮৭
২৫	মোঃ ফারুক হোসেন	ল্যাব মোড়, কুয়েট, খুলনা	০১৯৬১৬৪০২০৩
২৬	সৌমিত্র মন্ডল	হরিণটানা, ধোপাদী, দাকোপ, খুলনা	০১৫১৭০৬৬৪৮৫
২৭	তামান্না তাবাচ্ছুম মীম	খালিশপুর, খুলনা	০১৪০৫২৯৫৮৮৬
২৮	কল্লোল চাকমা	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৭২৭৪১৬৯৩৫
২৯	মোসাঃ অন্তরা খানম	লোহাগড়া, নড়াইল	০১৯০৫৭৬১০৮৬
৩১	হান্নান	পিরোজপুর	০১৯৫১৮৬১৯৮৯
৩৩	রাকিবুল হাসান	খানাবাড়ি, কুয়েট, খুলনা	০১৭৪৭৯৪৬৬৮৮

সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খুলনা

শ্রেণি: বিএড অনার্স, সপ্তম সেমিস্টার, ২০২১

কলেজ রোল	শিক্ষার্থীর নাম	ঠিকানা	মোবাইল নং
১	চন্দন রায়	দোলখোলা, খুলনা	০১৭৪৮৯৯২৩২৮
২	হুমায়রা খাতুন	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯১২৫৪০২৭৫
৩	মোঃ ইমরান শেখ	খানাবাড়ী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৬২৭১২৭৯৪
৪	মোঃ সুমন শেখ	খানাবাড়ি, কুয়েট, খুলনা	০১৭৯২৬২০৪৮১
৬	শাহরিয়ার কাদের ঢালী	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯৬১৬১৯৩৫১
৭	মাছুমা ইয়াসমিন	দৈবজ্ঞহাটী, মোড়েলগঞ্জ, বাগেরহাট	০১৭৯৮৪২২৮০৫
৮	মিলন কুমার দেবনাথ	মহেশ্বরপাশা, কুয়েট, দৌলতপুর, খুলনা	০১৯১৩০৬১০৭৪
৯	লায়লা শারমিন	দক্ষিণ টুটপাড়া, খুলনা	০১৭৪৩৭৫৪৮৯৩
১০	ইয়াছিন শেখ	খানাবাড়ি, কুয়েট, খুলনা	০১৯০৩৯০৪৫০৩
১১	মোঃ খালিদ হোসাইন শেখ	চালনা, দাকোপ, খুলনা	০১৯৬৯২৪৬৯৮৬
১২	ইয়াসমিন ইসলাম হ্যাপি	ফুলবাড়ি, কুয়েট, খুলনা	০১৯১৭১৪৬৭৮৬
১৪	তনুশ্রী দেবী বিশ্বাস	গাংনী, ডাকবাংলা, মেহের পুর	০১৭৬৪৬৪৫০০৬
১৫	মোসাঃ আরফিন নাহার	মিরপুর, কুষ্টিয়া	০১৭৬৪৭৪৩২৬১
১৯	মোঃ মেহেদী হাসান	খানাবাড়ী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৬২৪৫০৯৪৬
২২	মোসাঃ তানিয়া খাতুন	তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৩১৮১৩০৮৬
২৪	মোঃ মেহেদী হাসান	বুচিতলা, তেলিগাতী, কুয়েট, খুলনা	০১৯৮৫৫৬১৬৬০
২৫	জোহরা খাতুন	মিরেরডাঙ্গা, ফুলবাড়ীগেট, খুলনা	০১৬৩০৬৪২৯৫৮
২৯	মানসুরা খাতুন	শিরোমনি, খুলনা	০১৯৮১১১২৮৬৯
৩০	চন্দ্রিকা সরকার	দক্ষিণপাড়া, মহেশ্বরপাশা, খুলনা	০১৭৭৯৮৭৯৫৭১
৩২	ফুয়াদ আল হাসান	ডুমুরিয়া, খুলনা	০১৬২৬৩৮৯৫৯৯
৩৩	শিরিন আকতার	খালিশপুর, খুলনা	
৩৪	আব্দুল্লাহ আল মামুন	ফুলতলা, খুলনা	

গুণীজনের দৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ভাষণ

মোহাম্মাদ মহিববুল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বাঙালি শত শত বছর ধরে যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে, সংগ্রাম করছে, রক্ত দিয়েছে, অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহে অংশ নিয়েছে এবং তার ফলে স্বাধীনতার যে প্রত্যাশাটি উন্মুখ হয়ে উঠেছে তাকে ভাষা দিয়েছেন এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত একটি ঐক্যবদ্ধ বাঙালি জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। তাই তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা এবং এই সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট বাংলাদেশে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিতে পারেন তা আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন দেশ-বিদেশের সংবাদপত্রগুলো। দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ- এ ৬ মার্চ ছাপা হয় 'পূর্ব পাকিস্থানের একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা' শিরোনামে 'শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারেন। দ্য সানডে টাইমস' পত্রিকার ৭ মার্চ 'স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে' শিরোনামে একটি খবর ছাপা হয়। এ ব্যাপারে ৫ মার্চ খবর প্রকাশ করে দ্য গার্ডিয়ান, ৭ মার্চ ছাপে দ্য অবজারভার। এ থেকে বোঝা যায় ৭ মার্চ ভাষণ শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয় বরং বিশ্ববাসীর কাছে গুরুত্বের সাথে স্থান পেয়েছিল।

বঙ্গবন্ধুর এই সুন্দর ভাষণটি লিখিত ছিল না। এটি ছিল বঙ্গবন্ধুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক খান সারওয়ার খুরশিদ বলেন "আগের দিন রাত ৪টা পর্যন্ত জেগে আমরা তাঁর জন্য ৭ মার্চের ভাষণ ও তার ইংরেজি তরজমা করলাম। কিন্তু ভাষণ দেওয়ার সময় দেখা গেল আমাদের প্রস্তুত করা খসড়া তাঁর সামনে নেই এবং যে ভাষণ দিলেন তার সঙ্গে আমাদের খসড়ার কোনো কোনো পয়েন্ট ছাড়া আর কোন মিলই নেই"।

৭ মার্চ ভাষণ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেনঃ

"আমি আব্বার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছিলাম। মা পাশে এসে বসলেন। বললেন, 'আজ সারা দেশের মানুষ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। সামনে তোমার বাঁশের লাঠি, জনগণ আর পেছনে বন্দুক। এই মানুষদের তোমাকে বাঁচাতেও হবে- এই মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে হবে। অনেকে অনেক কথা বলবে তোমার মনে যে ঠিক চিন্তাটা থাকবে। তুমি সেই কথাটা বলবে। আর কারো কথায় কান দেব না। তোমার নিজের চিন্তা থেকে যেটা আসাবে সেটা সভাতে বলবা। এই ছোট্ট কথাটুকু মা আমার আব্বাকে ঐ সভায় যাবার আগে বলে দিয়েছিলেন"। ৭ মার্চের বক্তৃতায় যে স্বতঃস্ফূর্ততা সেটি হয়তো এই পরামর্শ থেকেই এসেছে।

মানুষকে জাগ্রত, উদ্দীপ্ত এবং তীব্র অধিকার সচেতন ও লড়াকু মানসিকতা সম্পন্ন করার জন্য সুদক্ষ বাগ্মীরা কতগুলো কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। বঙ্গবন্ধুও তাঁর জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে তা করেছেন পরিচ্ছন্ন দক্ষতা ও সুগভীর আন্তরিকতায়। মার্কিন সাময়িকী নিউজ উইক পত্রিকা তাঁকে উল্লেখ করেছেন রাজনীতির কবি হিসেবে।

৭ মার্চের ভাষণ বাঙ্গালিকে নতুন করে বাঁচতে শিখিয়েছিল। কবিতা লিখতেও উদ্বুদ্ধ হয়েছেন অনেক কবি। ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ কবি জসীম উদ্দীন বঙ্গবন্ধু কবিতায় ৭মার্চ ভাষণকে রূপ দিয়েছেন এভাবে-

"বাংলাদেশের মুকুটবিহীন তুমি প্রমূর্ত রাজ,
প্রতি বাঙালীর হৃদয়ে তোমার তক্ত-তাজ।
তোমার একটি আঙ্গুল হেলনে অচল যে সকার
অফিসে অফিসে তালা লেগে গেছে স্তব্ধ হুকুমদার।
এই বাঙলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাসী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত মধুর ডাক
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী- জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু- মুসলমান।

তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাঙলার"।

৭মার্চ ভাষণকে নিয়ে প্রাবন্ধিক শামসুজ্জামান খান বলেন-

ভাষণটি গঠনে কৌশল, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা, ইতিহাস থেকে নেয়া শিক্ষা, সময়জ্ঞান ও শব্দচয়নের মুন্সিয়ানা আছে। বাঙালিকে 'আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরন্ন মানুষ' 'আমার মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পূর্ববাংলার অধিকারবঞ্চিত জনগনের একেবারে হৃদয়ের ভেতরের ঢুকে যাওয়া তাঁর মতো নেতার পক্ষেই এই ভাষায় শ্রোতাদের সম্বোধন করা সম্ভব"।

সাংবাদিক আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী ঐতিহাসিক ভাষণটি সম্পর্কে বলেন-

একাত্তর সালের সাত মার্চের ভাষণ অবশ্যই একটি মহাকাব্য এবং এই মহাকাব্যের কবি শেখ মুজিব। মহাকাব্যের মতো এই কবিতার পরিধি বিস্তৃত নয়। কিন্তু বক্তব্যে, ভাবে ও ব্যঞ্জনায় মহাকাব্যের চাইতে বড়ো এবং বিস্তৃত। লিঙ্কনের কয়েক লাইনের গেটিসবার্গ ভাষণের মতো শেখ মুজিবের সাত মার্চের ভাষণটিও তাঁর অন্যান্য ভাষণের চাইতে তুলনামূলকভাবে ছোট হলেও শক্তিতে দুর্জয়। এই ভাষণ বাংলার মানুষের সুপ্ত চেতনাকে প্রচণ্ড আঘাতে জাগ্রত করেছে।

সেদিনের সেই শান্ত গম্ভীর কন্ঠের বজ্রধ্বনির বর্ণনা দিয়েছেন কবি নির্মলেন্দু গুণ-

হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার
সকল দুয়ার খোলা, কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী।
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ৭ মার্চের ভাষণকে মূল্যায়ন করে বলেন-

"পুরো বক্তৃতার আদেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,বক্তৃতাটি মূলত পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় বার্তা ও তার স্বাভাবিক অনুযাত্রায় পাকিস্তানের তদানীন্তন রাষ্ট্রকাঠামোর পূর্বাঞ্চলের পরিসমাপ্তির বিজ্ঞপ্তি ও বিবরণী।"

বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সঙ্গী তোফায়েল আহমদ সেদিনের ভাষণ সম্পর্কে যথার্থই বলেন-

"কত স্মৃতি আসে। কত সুখের স্মৃতি। কত বেদনার স্মৃতি। সাত মার্চের স্মৃতি অমলিন। মঞ্চে যখন তিনি উঠলেন, মনে হলো এই দিনটির জন্যই বঙ্গবন্ধুর সারাজীবনের সংগ্রাম আর অপেক্ষা। মনে পড়েছে সেই কথাটিই- এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। বঙ্গবন্ধু এলেন, দেখলেন আর হৃদয় জয় করে ফিরলেন।

মূলত বঙ্গবন্ধু ও ৭ মার্চ ভাষণ একসূত্রে গাঁথা। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন। স্বাধীনতা অর্জন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি। ৭ মার্চের ভাষণ শুধু বাঙালির নয়, 'বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল"। জয়তু বঙ্গবন্ধু, জয়তু ৭ মার্চের ভাষণ।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা

রেজাউল ইসলাম
বিড রোল-১৬, শিক্ষাবর্ষ-২০২০

আধুনিক যুগে যে ক'জন মহান বাঙালি তাদের নিখুঁত মেধা ও সুনিপুন চিন্তা-ভাবনার আলোক ছটায় বাঙালি জাতিকে বেঁচে থাকার নিরবিচ্ছিন্ন প্রেরণা জুগিয়েছেন, শ্বাপদসংকুল ও কন্টকাকীর্ণ গমনপথে আবির্ভূত হয়েছেন আলোকবর্তিকা হয়ে তাদের মধ্যে শীর্ষস্থানটি দখল করে রেখেছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের মহান স্থপতি ও সর্বাধিনায়ক, বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী রাষ্ট্রনায়ক, বাঙালি জাতির গর্বিত পিতা, বিশ্বের সকল প্রান্তের স্বাধীনতাকামী ও মেহনতী মানুষের বন্ধু, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ঔপনিবেশিক ও সম্রাজ্যবাদী শক্তির নাগপাশ হতে মুক্ত করে তিনি বাঙালি জাতিকে শুধুমাত্র একটা দেশই উপহার দেননি; সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো কেমন হবে-তারও একটি আধুনিক যুগোপযোগী রূপরেখা এবং ভাবনা দাঁড় করিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে গড়া ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের সেই ছোট্ট বাংলাদেশকে নিয়ে তার উন্নয়ন ভাবনা আজ সর্বজনবিদিত ও বহুল আলোচিত।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনাঃ

আজ বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের মধ্যে যে প্রভূত উন্নয়ন পরিলক্ষিত হয় তার স্বপ্নদ্রষ্টা এবং রূপকার ছিলেন বাঙালির অবিসংবাদিত রাষ্ট্রনায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর ঘটনাবহুল জীবন এবং তার সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন পাঠ করলে দেখা যায় তিনি তার মাতৃভূমি বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে কতদিন ভাবতেন। তার সমগ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জুড়েই ছিল বাংলাদেশের মাটি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের ভাগ্যের উন্নয়ন। তিনি সর্বভারতীয় রাজনীতির চেয়ে বাংলার রাজনীতি, বাংলার ভাগ্য নিয়ে বেশি ভাবতেন।

স্বাধীনতার অব্যাহতির পরে বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করতো এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৬০ ভাগ মানুষ ছিল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ভূমিহীন কৃষক ও দিনমজুর এবং অর্থনীতি ছিল কৃষি নির্ভর। এই বৃহৎ ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার গ্রাম উন্নয়নের এক সামষ্টিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল যার মধ্যে ছিল চাষাবাদ পদ্ধতির আধুনিকায়ন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রাম সমবায়, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষি জমির খাজনা মওকুফ, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, কুটির শিল্প স্থাপন এবং কৃষকের জন্য শস্যের ন্যায্য মূল্য নির্ধারণ করা।

গ্রাম উন্নয়নের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর সরকার শিল্পক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে বড় বড় শিল্প-কারখানা ব্যাংক, বীমা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের একাংশ জাতীয়করণের আওতায় নিয়ে আসে। কিন্তু পরিচালনাগত অদক্ষতা ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে সে পদক্ষেপ সফলতার মুখ দেখেনি। অব্যাহত বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর সরকার রপ্তানি বৃদ্ধিকল্পে প্রচলিত পণ্যের পাশাপাশি অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়। তারই ফলে আজ বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে অপ্রচলিত পণ্যের অবদান অনেক বেড়েছে। তবে শিল্প-বাণিজ্য নয়, বঙ্গবন্ধুর ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল গ্রাম উন্নয়ন, কৃষির উন্নয়ন, মেহনতি মানুষের আয় ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, সম্পদের সুষ্ঠু বন্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস ইত্যাদি।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড- এ দর্শনের আলোকে বঙ্গবন্ধু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, বিজ্ঞানসম্মত, মানসম্মত ও বাস্তবমুখী করার লক্ষ্যে দেশের নাম করা বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই- খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ১৯ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টে বঙ্গবন্ধুর ভূয়সি প্রশংসা করে বলা হয়, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিকতা, আগ্রহ, উৎসাহ ও সাহায্য ছাড়া কমিশনের পক্ষে এ দুরূহ কাজ সম্ভব করা হতো না। আমরা তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ"। এই একটি বাক্যই বলে দেয় এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর অবদান কত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী ছিল। শিক্ষার উপর জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য

শিক্ষাখাতে পুঁজি বিনিয়োগের চেয়ে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না"। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া উচিৎ বলে তিনি মনে করতেন। খুদা কমিশনের রিপোর্ট সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই ১৯৭৩ সালে দেশের ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করা হয়। এছাড়াও প্রায় ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার ৫৪ হাজার নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়। তার আমল থেকেই প্রথম ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা শুরু হয়। বস্তুত বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে, মননে ও মগজে ছিল শিক্ষার প্রতি অসামান্য ভালোবাসা ও অনুরাগ।

বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল আজীবনের। নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্বখ্যাত আইনজীবী সন ম্যাকব্রাইড বলেছিলেন "শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন স্বাধীনতা শুধু পতাকা পরিবর্তন ও দেশের নতুন নামকরণ বোঝায় না, তার দৃষ্টিতে স্বাধীনতার অর্থ হলো, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও নীতিবোধসম্পন্ন আদর্শবাদ"। বঙ্গবন্ধুর সকল কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি- গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। আমৃত্যু তিনি এ আদর্শগুলো হতে বিচ্যুত হননি।

দক্ষভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল রাজধানীতে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ও সম্পদকে প্রত্যন্ত এলাকায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা যেখানে স্থানীয় উন্নয়নের কাজ স্বতন্ত্রভাবে চালু থাকবে। সেখানে উন্নয়নের মূল একক হবে গ্রাম। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত গ্রাম সরকার স্থানীয়ভাবে কর সংগ্রহ করতে পারবে। স্থানীয় এ কর্তৃপক্ষের প্রধান কাজ হবে- গ্রামীণ জনশক্তির ব্যবহার, ভূমি সংস্কার কর্মসূচি, উফসি চাষ সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির বাস্তবায়ন এবং গ্রামীণ কৃষিশিল্পের প্রসার। মোটকথা, বঙ্গবন্ধু প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এবং স্থানীয় সরকারের এবং গ্রাম সরকারের সঙ্গে শহরের ব্যবধান কমিয়ে আনতে চেয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন বলে বুঝতে পেরেছিলেন প্রচলিত আর্থ- সামাজিক কাঠামোর দেশকে দ্রুত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়। ধ্বংস, স্বয়ম্ভরতা অর্জন এবং দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে হলে গোটা ব্যবস্থারই পরিবর্তন দরকার। সে লক্ষ্যেই তিনি ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ (বাকশাল) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সমাজের কল্যাণকামী, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ সকল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তিকে এক কাতারে ঐক্যবদ্ধ করে জাতীয় পুনর্গঠন মহাকর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন। অনেকেই বিষয়টিকে আক্ষরিক অর্থে একদলীয় শাসন হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করলেও বাস্তবতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু "বাকশাল" নামে যে জাতীয় ঐক্যের ডাক দেন, সেখানে সর্বস্তরের জনসাধারণ, বেসামরিক প্রশাসন ও সামরিক বাহিনী সহ সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরও রাজনৈতিক পক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন। এ অভিনব ব্যবস্থাটি চালু হওয়ার পর সমগ্র দেশে মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্গবন্ধু বলেন, "কেন সিস্টেম পরিবর্তন করলাম? সিস্টেম পরিবর্তন করেছি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে। সিস্টেম পরিবর্তন করেছি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য"। এ থেকেই বোঝা যায়, বাকশাল প্রতিষ্ঠার পিছনে বঙ্গবন্ধুর কোনো অসৎ ও হীন উদ্দেশ্য ছিল না বরং তিনি দেশের কল্যাণের জন্য এ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন।

কেমন বাংলাদেশ চাই- প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রথম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বেতার ও টিভি ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সমাজ বিপ্লবে বিশ্বাস করে। এটা কোন অগণতান্ত্রিক কথা নয়। আমার সরকার ও পার্টি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একটি নতুন ব্যবস্থার ভিত্তি রচনার জন্য পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা উপড়ে ফেলতে হবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়বো। বঙ্গবন্ধু জীবনদর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন। তার এ দর্শনের ভিত্তিমূলে ছিল ঐতিহাসিক বিশ্বাস, যা কেবল তার মতে, জনগনই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শন অনুযায়ী, গণ মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করার

লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশের, যেখানে সাংবিধানিকভাবেই প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জণগণ। তার এ দর্শনের স্পষ্ট প্রতিফলন- তাঁর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন, দুর্নীতি-শোষণ-বঞ্চনা- দুদর্শামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক গণ্ডির মধ্যেই কেবল আটকে ছিল না বঙ্গবন্ধুর দর্শন বা চিন্তা-ভাবনা। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও তার চিন্তার জগৎ বিস্তৃত ছিল। তিনি সাহিত্য সংস্কৃতিকে গুরুত্ব দিতেন এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে তিনি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা দিয়েছেন। নজরুলের কবিতাকে করেছেন বাংলাদেশের রণসঙ্গীত। বিদ্রোহী কবি নজরুলকে নিয়ে এসেছেন কোলকাতা থেকে ঢাকায়। জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি কবি আল মাহমুদকে চাকরি দিয়েছেন। নাটকের উপর থেকে প্রমদ কর ও সেন্সর প্রথা সহজ করে তিনি সংস্কৃতির দ্বার উন্মোচন করেন। বঙ্গবন্ধু প্রাদেশিক মন্ত্রী থাকাকালে ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালের ৪ এপ্রিল তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদে চলচিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল উথাপন করেন। তিনিই বাংলাদেশের ছায়ছবি নির্মাণের গোড়াপত্তন করেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির আদি সাহিত্যকর্ম ও ইতিহাস সংরক্ষণ, গণমানুষের সঙ্গীত ও নাট্যচর্চা এবং জাতীয় ঐতিহ্যের সাথে সম্পর্কিত শিল্পকর্মের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং সেসব জাতীয় কৃষ্টি কালচারের চেতনা ও আদর্শ হৃদয়ে ধারণ ও লালন করতেন।

পরিশেষে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনার ব্যপ্তি ছিল সর্বত্র। তার উন্নয়ন দর্শন ও চিন্তা ধারা ছিল সার্বজনীন, অব্যর্থ ও কালজয়ী। আমৃত্যু তিনি যে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বুকে ধারণ করেছিলেন এবং সেই অ পূর্ণ স্বপ্ন হৃদয়ে আঁকড়ে ধরে ধরাধাম ত্যাগ করেছিলেন, তার সেই স্বপ্ন আজ তার কল্পনা নয়, নয় কোন অলীক বাসনা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আজ তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। আজকে আমরা যে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশকে দেখি, এদেশের আনাচে-কানাচে যে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দেখি, পিচঢালা রাস্তা-ঘাট, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিক্য দেখি, দেখি মেট্রোরেল কিংবা পদ্মাসেতুর দৃশ্যমান বাস্তবতা তার স্বপ্নদ্রষ্টা আর কেউ নন, তিনি হলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, গণতন্ত্রের বরপুত্র, বিংশ শতাব্দির অবিসংবাদিত রাষ্ট্রনায়ক, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

"বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা ও বাংলাদেশ"

জগন্নাথ দে
এমএড, রোল: ০৪, শিক্ষাবর্ষ-২০২০

"শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলায় আগামীদিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলব। ক্ষেত-খামার কলকারখানায় দেশ গড়ার আন্দোলন গড়ে তুলব। কাজের মাধ্যমে দেশকে নতুন করে গড়া যায়। আসুন সকলে মিলে সমবেতভাবে আমরা চেষ্টা করি যাতে সোনার বাংলা আবার হাসে, সোনার বাংলাকে আমরা নতুন করে গড়ে তুলতে পারি"।

(বঙ্গবন্ধুর বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ, ২৬ মার্চ ১৯৭২)

জাতির পিতার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি আমাদের জাতির জনক। অসামান্য নেতৃত্বে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, মেধা-মমত্ববোধ, সততা এবং দেশপ্রেমের প্রজ্বলিত এক অগ্নিশিখা। যার উত্তাপ এখনো চিরন্তন। মৃত্যুকে পরোয়া না করে তিনি গোটা বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিলেন। এনে দিয়েছিলেন পাকিস্তানি শোষণের হাত থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করে 'বাংলাদেশ' নামের এক নতুন সূর্যোদয়। ছিলেন তিনি এক মহৎ মানবিক প্রাণ। ছিলেন প্রকৃত বীর। যার সরল, দৃঢ়, সাহসী মুখচ্ছবি দেখলেই যেন পুরো বাংলাদেশকে দেখা যায়। তাই তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর। তাইতো কবির কণ্ঠে শোভা পায়-

"মরেও অমর তুমি ধরণির বুকে
তোমার কীর্তি রবে সবার মুখে মুখে
তুমি ছিলে তুমি আছো তুমি থাকবে।"

বঙ্গবন্ধুর প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্যই ছিল এদেশের গরিব-দুখি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করা। এ কারণে আমরা দেখতে পাই সেই ছোটবেলা থেকেই এবং পরবর্তীতে তাঁর সমস্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে এটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যেখানে গিয়েছেন সেখানেই উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন মানুষের উন্নয়নের কথা। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মাঝে বরাবরই প্রতিস্ফুটিত হয়েছে এটি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শনে সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার পান এদেশের সাধারণ জনগণ। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তাদের মুখে হাসি ফোটাতে এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে তিনি বিরাট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেন। একই সাথে বিভিন্ন দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হন। ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রি হওয়ার পরপরই তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন, সংবিধান প্রণয়ন, এক কোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন, যুদ্ধে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) পুনর্গঠন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, মদ, জুয়া, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধকরণ, ইসলাম ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, নতুন ১১ হাজার প্রথামিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ মোট ৪০ হাজার প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুস্থ মহিলাদের জন্য নারী পুনর্বাসন ব্যবস্থা, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ প্রায় ৩০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ, কৃষকদের মাঝে দেড় লাখ গাড়ি ও ৪০ হাজার সেচ পাম্প বিতরণ এবং ব্যাপক কৃষি উৎপাদনে উৎসাহ দেবার জন্যে 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার' প্রতবর্তন করেন। এ পরিত্যক্ত ব্যাংক বীমার ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ ও সেসব চালুর মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান, সার কারখানা, বঙ্গ শিল্প কারখানা চালুসহ একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় এবং জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক সাফল্য। স্বাধীনতা লাভের এক বছরের মধ্যেই দেশ পুনর্গঠনে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ, পুরো দেশবাসিকে এ কাজে উজ্জীবিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া পদক্ষেপ সমূহ আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকারসহ আম জনতার বিভিন্ন অধিকার নিয়ে বঙ্গবন্ধু সব সময় সক্রিয় ছিলেন। এজন্য তাকে জেলে যেতে হয়েছে বারবার। এসব ঘটনা কতো কবিতার জন্মদাত্রী।

তিনি তাই বলেছেন-

"আমি সব ত্যাগ করতে পারি, তোমাদের ভালোবাসা আমি ত্যাগ করতে পারিনা।"

স্বনির্ভর জাতি গঠনে তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। ভিক্ষুক জাতির ইজ্জত থাকে না। বিদেশ থেকে ভিক্ষা করে এনে দেশকে গড়া যাবে না। দেশের মধ্যেই পয়সা করতে হবে। এ উক্তি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- ধ্বংসপ্রাপ্ত কৃষি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ অধিক কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্যে ধানবীজ, পাটবীজ ও গমবীজ সরবরাহ করা হয়। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কবিতায় বঙ্গবন্ধু তাই সব কবির প্রেরণার জায়গা কবিতায়-

"মাটির মানুষ শেখ মুজিবুর
কোথায় তুমি নেই
তোমার ছবি টাঙানো আছে
দেশ জুড়ে সবখানেই।"

বঙ্গবন্ধু ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবন্টনের ফর্মুলা নির্ধারণে অত্যন্ত জোরালো উদ্যোগ নেন। এর ফলে ভাটির দেশ হিসেবে গঙ্গার পানির ৪৪ হাজার কিউসেক হিস্যা পাওয়ার সম্মতি তিনি আদায় করেন।

১৯৬৮-৬৯ সালের ১১ হাজার শক্তিচালিত পাম্পের স্থলে ১৯৭৪-৭৫ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬ হাজার। এর ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। বাংলার কৃষকের সারে ভর্তুকি দিয়ে রক্ষা করেন বঙ্গবন্ধু। কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির যে-ধারা সূচিত হয়েছিল তারই ফলে আজ কৃষিক্ষেত্রে শক্তিশালী ধারা বজায় রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা সেই ধারাকে আরো বেগবান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আমাদের আত্মোপলব্ধিতে নিলে দেখতে পাব তাঁর উন্নয়ন দর্শন কতটা সাধারণ মানুষ কেন্দ্রিক ছিল-

"Do justice to the people, Care for the sentimens of the people, respect the sentiments of the people, and allow them to decide."

তিনি বলেন-

"আন্দোলন গাছের ফল নয়। আন্দোলন মুখ দিয়ে বললেই করা যায় না। আন্দোলনের জন্য জনমত সৃষ্টি করতে হয়। আন্দোলনের জন্য আদর্শ থাকতে হয়। ত্যাগী মানুষ থাকা দরকার। আর সর্বোপরি জনগনের সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ সমর্থন থাকা দরকার।"

তিনি আরও বলেন-

"সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। শোষিত, নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত বাংলাদেশের সমাজদেহে সমস্যার অন্ত নেই। এই সমস্যার জটগুলোকে খুলে সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে।"

স্বল্প পরিসরে এই আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বঙ্গবন্ধুর সকল ভাবনার মূলে ছিলো সাধারণ মানুষ। সেই শৈশব থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিনগুলোতেও তিনি কৃষকের কল্যাণ, শ্রমিকের কল্যাণ, সাধারণের মঙ্গল ভাবনায় ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ। প্রশাসক হিসেবেও সর্বক্ষণ তাঁর পক্ষপাতিত্ব ছিল সাধারণের দিকে। তাঁর দেওয়া সংবিধানই এর বড় প্রমাণ। সাধারণ মানুষকে তিনি প্রজাতন্ত্রের মালিক বানাতে চেয়েছেন ঐ সংবিধানের মাধ্যমে। তাঁর শাহাদাৎ বরণের পর স্বদেশ হাঁটতে থাকে অন্ধকার ও অনিশ্চিত এক গন্তব্যের দিকে। দীর্ঘ একুশ বছর ধরে উল্টো পথে হাঁটা সেই বাংলাদেশকে ১৯৯৬ সালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সড়কে তুলে আনেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

সাম্রাজ্যবাদী চক্র মেনে নেয়নি দরিদ্র বাংলাদেশের আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার প্রস্তুতি। পরিণতি কী হয়েছে তা আমরা জানি। বীরের মত মৃত্যুবরণ করেছেন বঙ্গবন্ধু। ঘাতক হরণ করতে পারেনি তাঁর আত্মমর্যাদা। জনৈক গবেষকের ভাষায়-

"বঙ্গবন্ধুকে আজ আমরা পেয়েছি এই ইতিহাসের পাদপীঠে যেখানে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষায়, ভালোবাসা-বেদনায় আর কর্মের প্রবাহে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আবহমান বাংলা ও বাঙালিকে। বঙ্গবন্ধুকে আমরা হারিয়েছি এই মর্মান্তিক কথাটি কখনো আমাদের অন্তরে সত্য হতে পারে না।"

দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য দেশকে সম্পদশালীকারী এবং সেই সম্পদের মালিক যাতে গরিব-দুঃখী মানুষ হতে পারে, তা নিশ্চিত করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবন-দর্শনের মোদ্দা কথা। বঙ্গবন্ধুর দেওয়া সেই কর্তব্যভার পালন করাই হচ্ছে বর্তমান সরকারের ব্রত।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মহানুভবতা তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে চিরকাল। কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেছেন-

"আমি হিমালয় দেখিনি, আমি দেখেছি শেখ মুজিবকে।"

উপসংহারের উপকূল দাঁড়িয়ে তাই বলতে হয়-

"যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরি, যমুনা বহমান

ততদিন বরে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।"

"বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা"

সাকেরা খাতুন
এমএড, রোল : ১২, শিক্ষাবর্ষ- ২০২০

প্রারম্ভিকা:

"বঙ্গবন্ধু নেই বলে দুঃখ যারা করে,
জানুক তারা বঙ্গবন্ধু আছে প্রতি ঘরে।
ঘুচিয়ে দেবে মায়ের দুঃখ, পিতার অপমান,
এই বাংলার মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।।
বাংলা তোমার অনেক প্রিয়, নয়কো কারো অজানা
তাইতো তোমার বাংলা নিয়ে হাজার উন্নয়ন ভাবনা"।।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তিনি এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধুকে কোন বিশেষণ দ্বারা মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তিনি আমাদের জাতীয় আশা- আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তিনি আমাদের চেতনার অগ্নিপুরুষ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত মহান নেতা। তার গৌরবময় কর্মজীবন হাজার বছরের বাঙালিদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নামের নতুন ভূখন্ডের নির্মাতা তিনি। তিনি ছিলেন ক্ষণজন্মা, মন্ত্র উদগাতা সফল এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। শুরু হয়েছিল যার জীবন "খোকা" থেকে ক্রমান্বয়ে অর্জন করেছিল বঙ্গবন্ধু, মহান স্থপতি, মহান নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাঙালি জাতির পিতা, ইতিহাসের মহানায়ক, রাজনৈতিক কবি (The Poet of Politics) আরও কত কি; কিন্তু এত বড় মাপের মানুষ হয়েও মিশে গেছেন বাংলার মাটি ও মানুষের সাথে। বাংলার নির্যাতিত মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরেছেন। বাংলার নির্যাতিত জনগনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। এই বাংলার উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। বাংলাদেশের উন্নয়নের শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ- বিদেশে। তার গ্রহণ করা পদক্ষেপ, নীতি এবং ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন আজকের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার বাংলাদেশ।

উন্নয়নের পথে অগ্রযাত্রা:

তৎকালীন পৃথিবীতে ছোট-বড় মিলিয়ে একশত নব্বইটি দেশ। সেই একশত নব্বইটি দেশের মধ্যে বাঙালি প্রথম রাষ্ট্র পেল। পেল শেখ মুজিবের মতো নেতা। নেতা এখন নিজেকে নিয়োজিত করলেন বাংলাদেশ গড়ায়। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন। গঠন করলেন মন্ত্রি পরিষদ। শুরু করলেন নতুন সার্থক সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়। তিনি জুয়া মদ নিষিদ্ধ করলেন। কারণ এগুলি জনগনকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে দেয়। জনগন ধ্বংস হলে সে দেশের উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা ছিল সূদূর প্রসারী। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নামকরণ করলেন প্রিয় নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নামে। ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে গঠন করলেন সংবিধান প্রনয়ন কমিটি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ, রাস্তাঘাট, পুল, কালভার্ট, ব্রিজসহ ভেঙ্গে রেখে গেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। ব্যাংকে টাকা নেই, পাকিস্তানিরা টাকা পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু দমলেন না। তিনি বাংলাদেশের জন্য বিশ্ববাসীর সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি মাথা উঁচু করে তার উন্নয়ন ভাবনা তুলে ধরলেন। একই সাথে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দেশ গড়ার সংগ্রামে যুক্ত হওয়ার আহবান জানালেন। সাথে সাথে প্রশাসনিক কার্যক্রমও সচল হতে শুরু করলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে সাহায্য চাইলেন শেখ মুজিব। তিনি আরও বললেন আমি দুনিয়ার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছি। আমি সাহায্য চাই, আমি আমার জনগণকে বাঁচাতে চাই, দেশের উন্নয়ন করতে চাই। আমার জনগণকে বাঁচানোর জন্য দুনিয়ার মানুষের কাছে আমি আবেদন জানিয়েছি। অবশ্যই সেই সাহায্য দ্বারা আমার দেশের উন্নয়ন হবে। বঙ্গবন্ধু শুরু করেন জাতীয়করণ কার্যক্রম। তুলে নেয় লবনের ওপর থেকে কর। যাদের ২৫ বিঘার উপর জমি তাদের খাজনা মওকুফ করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ঘোষিত কর্মসূচিই ছিল এ দেশের সাধারণ মানুষের উন্নয়ন। তিনি শোষণমুক্ত সমাজ গড়তে ও বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি:

"সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়" এই মূলমন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেছিলেন তার পররাষ্ট্রনীতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাউকে ক্ষমা করেননি শেখ মুজিব। বরাবরই তিনি চেয়েছেন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। তার পররাষ্ট্রনীতি ছিল

সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব। আমি সমস্ত দুনিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাস করি। আমরা কো-একজিস্টেনসে বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাস করি। তিনি পারস্পারিক সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বললেও নিজ দেশের স্বার্থরক্ষায় সচেতন ছিলেন। দেশের উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন এবং দেশ গঠনের জন্য দৃঢ়তার সাথে সাহায্যে এনেছেন বিভিন্ন দেশ থেকে এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরী করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস চালানো হয়। অতি অল্প সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ ছিল বঙ্গবন্ধুর উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ৯ জানুয়ারি লন্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সাথে সাক্ষাত হয়। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন কর্মকান্ড এবং দেশের জন্য শান্তিপূর্ণ কাজ করার জন্য '১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ' "জুলিও কুরী" পুরষ্কারে ভূষিত করেন। ১৯৭৪ সালে যখন বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৭৬.৩৯ মিলিয়ন শতকরা বৃদ্ধির হার ২৮.৩৫ আর বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ছিল ২.৪৮। এমতাবস্থায় বঙ্গবন্ধু তার ক্ষুধার্থ জনগনের কথা চিন্তা করে ১৯৭৪ সাল সফর করেন "কিউবা রাষ্ট্র"। সেখানকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছিল "ফিদেল কাস্ত্র"। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাত করেন এবং তার নিকট তার প্রিয় সোনার বাংলা সম্পর্কে সবকিছু তুলে ধরেন এবং উন্নয়ন তরান্বিত করার দৃঢ় মনোবল ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর এই দৃঢ়চেতা মনোভাব দেখে কিউবার প্রেসিডেন্ট ব্যক্ত করেন-

"আমি হিমালয় দেখিনি তবে শেখ মুজিবকে দেখেছি"।

শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা:

"Education is the backbone of a nation"- শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এই কথাটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। শিক্ষিত, মর্যাদাসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বদ্ধ পরিকর। আর সেই উদ্দেশ্যে দেশের সকল বালক-বালিকাকে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করানোকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য হিসেবে মনে করে জাতীয়করণ করেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষাকে এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হওয়ার পরই প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। শিক্ষাবিদ আবুল ফজল বলেছিলেন-

"শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির শিক্ষিত জনশক্তি তৈরীর কারখানা
আর রাষ্ট্র ও সমাজ দেহের সব চাহিদার সরবরাহ কেন্দ্র।
এখানে ত্রুটি ঘটলে দুর্বল আর পঙ্গু না করে ছাড়বে না।"

এই উপলব্ধি থেকে বঙ্গবন্ধু উন্নয়নের স্বার্থে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক সকল পর্যায়ে সবার জন্য শিক্ষার অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। এমনকি দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে কারিগরী শিক্ষা বা কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি দেন বিশেষ গুরুত্ব। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে তথা মর্যাদার সাথে টিকে থাকতে হলে শিক্ষার বিকল্প নেই। এই কথা মাথায় রেখে তিনি সর্বস্তরে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কর্মমুখি শিক্ষার প্রতি দেন বিশেষ নজরদারি। কর্মমুখী শিক্ষাই ছিল এদেশের আর্থিক নিশ্চয়তার উৎস। সমাজে উদ্ভব ঘটেছিল বৃত্তিভিত্তিক শ্রেণীর। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমার দেশে সম্পদের কমতি নেই, কিন্তু প্রয়োজন এগুলোর সঠিক ব্যবহারের। তাই তিনি আহ্বান করেছিলেন অসামান্য গুণগত দক্ষতা নিয়ে প্রত্যেক পরিবারে গড়ে ওঠে যে বৃত্তি শিক্ষার এক নিপুন প্রতিষ্ঠান। কারণ বিশ্বের দৃষ্টি নন্দন শিল্প হচ্ছে আমাদের ঢাকাই মসলিন; জামদানি শাড়ি, রেশম বস্ত্র, এমনি আরও ক্ষুদ্র শিল্প। কর্মমুখী শিক্ষা যদিও দু'ধরনের (ক) সাধারণ কর্মমুখী শিক্ষা এবং (খ) বৃত্তিমূলক কর্মমুখী শিক্ষা। ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ এরা বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ নিয়ে ইচ্ছামতো স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত হতে পারে। কিন্তু কিছু হাতে কলমে শিক্ষার মাধ্যমে যে কোন মানুষ দক্ষতা অর্জন করে নিজে সাবলম্বী হতে পারে এবং দূর করতে পারে দারিদ্রতা। যেমনঃ কুটির শিল্প, মৎস্য চাষ, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, সেলাইকার্য, বিদ্যুতের কাজ, বই বাঁধাই ইত্যাদি। এভাবেই বঙ্গবন্ধু কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন এবং দেশের মানুষের দারিদ্রতা দূর করে সোনার বাংলা গড়তে। তিনি আরও বলেছিলেন দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্মমুখী শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে সরকারি বে-সরকারি উদ্যোগে দেশে কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন। কৃষিকার্যে সহায়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনের ওপর অধিক জোর দিতে হবে। স্বল্পমেয়াদি কোর্সে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে আমাদের তরুণ বেকারদের সুদক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন একমাত্র কর্মমুখী শিক্ষাই আমাদের মত জনবহুল দেশে সমৃদ্ধি বয়ে আনতে পারে। আর শিক্ষার মাধ্যমে দেশকে উন্নত করার লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা, মানসিক বিকাশ ঘটালেও কর্মমুখী শিক্ষা দ্বারা দেশের উন্নয়ন তরান্বিত করার সমন্বিত উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

সামগ্রিক উন্নয়ন:

"পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে-
আপনার কথা ভুলিয়া যাও"।

সকলের সাথে মিলেমিশে জীবনধারা এবং সুখে দুঃখে একে অপরের পাশে এসে দাঁড়ানোর মধ্যেই জীবনের যথার্থ স্বার্থকতা নিহিত। নিজের স্বার্থের জন্যই কেবল নয়, বঙ্গবন্ধুর দর্শনটা ছিল ঠিক তেমনিই। মাত্র কিছু দিনের মধ্যে মহান নেতা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ, নারীর ক্ষমতায়ন, অলাভজনক উন্নয়ন উদ্যোগ, গ্রামীণ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এসব ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা যথেষ্ঠ সাফল্য দেখিয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে শেখ মুজিবুর রহমান গ্রহণ করেছিলেন নানা উদ্যোগ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা: Time is life, life if time. Balance between life and time can be reach the highest apex of success. জীবনের সকল কর্মকান্ড যথাসময়ে শেষ করার মধ্যেই স্বার্থকতা অর্জন করে। এই মতাদর্শ সামনে রেখে তিনি যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের যোগাযোগকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছিলেন। ক) জল পথ খ) স্থল পথ গ) আকাশ পথ।

জলপথ: বাংলাদেশে দুই ধরনের জলপথ রয়েছে। যেমনঃ ১। নদীপথ ও খালপথ ২) উপকূলীয় সমুদ্র পথ। কারবার বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। বাংলাদেশে প্রায় ৮,৪০০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিঃ কিঃ সারা বছর নৌ চলাচলের জন্য উপযুক্ত থাকে। বাকী ৩০০০ কিঃ মিঃ কেবল বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়। বঙ্গবন্ধু সেই ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের জন্য নদী খনন প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন। নদীর নাব্যতা তৈরিতে গ্রহণ করেছিলেন নানা পদক্ষেপ। যার সফল বাস্তবায়ন বঙ্গবন্ধু না করতে পারলেও তাঁর কন্যা সফল বাস্তবায়ন করে চলেছেন। উন্নয়ন ঘটিয়েছেন দেশের গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দরগুলির। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি ও খুলনা এর উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

স্থল পথ: ১৯৪৭-১৯৭০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সড়ক পথের পরিমাণ ছিল ৩৮,৬২৩.৪৫ কিলোমিটার। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তার প্রায় অধিকাংশ বিদ্ধস্ত হয়েছিল। তারপরও বঙ্গবন্ধু তার চিন্তা ভাবনা কাজে লাগিয়ে আবার রাস্তাঘাত মেরাতের জন্য মহাকর্মযজ্ঞ হিসেবে বাংলার নির্যাতিত মানুষকে কাজে লাগিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থার গতি বৃদ্ধিতে স্থল পথকে সচল করে তুলেছিলেন।

রেলপথ: বাংলাদেশের রেলপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম রেলপথের সূচনা হয় ১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশের রেলপথের পরিমান ছিল প্রায় ২,৮৫৭ কিলোমিটার। বাংলাদেশে দু'ধরনের রেলপথ রয়েছে। ক) ব্রডগেজ ও খ) মিটারগেজ। মহান মুক্তিযুদ্ধে এই রেলপথের মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু জানতেন একটি দেশের উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই তিনি যোগাযেগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিরলস কাজ করেছেন।

উপসংহার:

"এতসব যার প্রাণ উৎসব সেই আজ শুধু নাই
সত্য প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হল ছাই!
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশুন্যে মিলালো ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সেই রয়ে গেল চির আঁকা"।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তার সত্য প্রাণ অমর হয়ে আছে আমাদের মাঝে। যারা ভুল করে বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিলো আজ তারাও মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু তুমি রয়ে গেছো কোটি বাঙালীর হৃদয় পটে আঁকা। কারণ মাত্র সাড়ে তিন বছরে তুমি দেশের জন্য যে উন্নয়নের মানচিত্র এঁকে রেখে গেছো, প্রতিটি ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন ভাবনা তোমার ছিলো, তারই বাস্তবায়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে তোমারই যোগ্য উত্তরসূরী।

"বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা"

খালিদ সাইফুল্লাহ
বিএড, রোল : ৬৩, শিক্ষাবর্ষ-২০২১

প্রারম্ভিকা:

"এদেশে কৃষক শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সবাই সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে"। *(১০ জানুয়ারি, ১৯৭২-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)*

এই দেশ হিন্দুর না, এই দেশ মুসলমানের না, এই দেশকে যে নিজের বলে ভাববে এই দেশ তার। এই দেশের কল্যান দেখে যার মন আনন্দে ভরে উঠবে এই দেশ তার। এবং এই দেশের দুঃখে যে কাঁদবে এই দেশ তার।"- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। শৈশবকাল থেকেই তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ দিয়ে মানুষকে বিচার না করে প্রত্যেককেই মানুষ হিসেবেই দেখতেন। উপযুক্ত উক্তিদ্বয় বঙ্গবন্ধুর এক অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি বিশ্বে এক অসাম্প্রদায়িত নেতা হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সংক্ষিপ্ত জীবন পরিচিতি:

পঞ্চান্ন বছর যাপিত জীবন ছিল বঙ্গবন্ধুর। সময়ের বিচারে সংক্ষিপ্ত হলেও জীবনের দৈর্ঘ্যের চেয়ে কর্মের পরিব্যাপ্তি ছিলো অনেক বেশি। ইংরেজিতে বলা হয় "Larger than life" জীবনের চেয়ে বড়। অল্প কথায় এ মনীষীর জীবনী তুলে ধরা সম্ভব নয়। তবুও এক নজরে তার সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো-

১৯২০ সাল

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। শেখ লুৎফর রহমান ও মোসাম্মাৎ সায়রা খাতুনের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। শৈশবকালে মা-বাবা তাকে "খোকা" বলে ডাকতেন। তাঁর শৈশব কাটে টুঙ্গিপাড়ায়।

- ১৯২৭ সালে ৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হন।
- ১৯৩৪ সালে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হলে পড়ালেখার বিরতি দিয়ে ১৯৩৭ সালে পুনরায় শুরু করেন।
- ১৮ বছর বয়সে ১৯৩৮ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিবাহ সম্পন্ন করেন। তাঁর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ও তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল।
- ১৯৩৯ সালে ছাত্রাবাসের দাবীতে আন্দোলন করেন ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন এ যোগদান করেন।
- ১৯৪২ সালে এস. এস.সি পাশ করেন। ১৯৪৩ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৪৪ সালে তিনি ছাত্রলীগের ডিসট্রিক্ট এ্যাসোসিয়েশন এর সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া কলেজের জি এস নির্বাচিত হন।
- ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
- ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগ এর সাধারন সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৫৫ সালে গন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯৬৮ সালে আগরতলা মামলার প্রধান আসামী হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচিত নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতার ঘোষনা দেন, ১৯৭৫ সালে ঘাতক কর্তৃক সপরিবারে শাহাদাত বরণ করেন।

শৈশবে অসাম্প্রদায়িক বঙ্গবন্ধু:

শৈশব কাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন একজন বিচক্ষণ বালক। মা বাবা আদর করে তাকে "খোকা" বলে

ডাকতেন। তিনি ছিলেন বন্ধুদের খুব প্রিয় পাত্র। শিক্ষা জীবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহপাঠীদের সাথে সদা সর্বদা কোমল আচরণ করতেন। হিন্দু, মুসলিম, জাতি, ধর্ম-বর্ণ কোন ভেদাভেদ না করে তিনি সকলের সাথে মিলেমিশে চলতেন। তার হিন্দু বন্ধু গোপালের কথা গল্পের মাধ্যমে জানতে পারলেও প্রকৃত পক্ষে অনেক গরিব ও দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের সাথে তিনি সখ্যতা গড়ে তোলেন। গরিব অসহায় লোকদেরকে তিনি সহয়তা করতেন। গরিব সহপাঠীদেরকে তিনি বাসায় এনে পাশে বসে খাবার খেতে দিতেন। তাঁর এ আচরণে মা-বাবা খুশি হতেন।

ঈদের দিন গুলোতে ছোট্ট বঙ্গবন্ধু যিনি "খোকা" নামে পরিচিত ছিলেন তিনি সব হিন্দু বন্ধুদের বাসায় এনে দাওয়াত করে খাওয়াতেন। আবার পুজো, বড়দিন ইত্যাদি দিনগুলোতে বন্ধুদের বাসায় বেড়াতে যেতেন। এভাবে শৈশবেই বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ফুটে ওঠে।

কৈশরে অসাম্পদায়িক মনোভাবঃ

মূলত কিশোর বয়স থেকেই বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক চর্চা শুরু করেন। সে সময়ে বঙ্গবন্ধু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে রাজনৈতিক গুরু হিসেবে গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু যখন মিশন স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন ছাত্রাবাসের দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে প্রথম নজরে আসেন বঙ্গবন্ধু। সহপাঠীদের সাথে তাঁর আচরণ ছিলো মনোমুগ্ধকর। কিশোর বয়স থেকেই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব গড়ে ওঠে। তিনি বলেন-

"আমার কাছে তখন হিন্দু-মুসলমান বলে কোনো জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিলো। একসাথে গান বাজনা, খেলা ধুলা, বেড়ানো সবই চলতো একসাথে"-বঙ্গবন্ধু *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*

কিশোর শেখ মুজিবুর রহমান এর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ছিলো এমনই। তৎকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ লেগেই থাকতো। তিনি প্রায়ই তাদের মধ্যকার বিবাদ মিমাংসার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। এভাবেই কিশোর বয়স থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে ধীরে ধীরে তারুণ্যের দিকে ধাবিত হন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনঃ

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান যারা হন তাদের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক দর্শন থাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানেরও একটি রাজনৈতিক দর্শন ছিলো। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক ও কলামিষ্ট আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেন-"বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক দর্শন ছিল। তা হলো গান্ধীর রামরাজত্ব এবং জিন্নাহর মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্টার দর্শনের বিপরীত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা"

তাঁর রাষ্ট্র দর্শনটি ছিলো স্পষ্ট ও পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক। তিনি তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের ভিত হিসেবে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করেন। 'মুজিববাদ' নামে তৎকালীন লেখক খোন্দকার মোহাম্মাদ ইলিয়াসের গ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন সমালোচকদের নানা দিক উঠে আসে। সুতরাং বলা যায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনগুলোর মধ্যে প্রাধান্য পায়-

- ধর্ম নিরপেক্ষতা
- গণতন্ত্র
- সমাজতন্ত্র

গণমানুষের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুঃ

- ১৯৪৩ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু। ঐ বছরই মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।
- ১৯৪৬ সালে ইসলামিয়া ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জি.এস) নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ পরবর্তী বিভিন্ন দাঙ্গা প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। যা অসাম্প্রাদায়িক চেতনার প্রতিফলন।
- ১৯৪৮ সালে ৪ঠা জানুয়ারী 'মুসলিম ছাত্রলীগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত দাবী আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালের ২০ শে জুন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে তিনি যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে ৯ জুলাই দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি সর্বদা অসাম্প্রদায়িক একটি রাজনৈতিক দলের স্বপ্ন দেখতেন। যেখানে সবার অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে। ১৯৫৫ সালে গণ পরিষদের নেতা হন। যা ছিল তার জনপ্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ।

❖ এভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক অসাম্প্রদায়িক নেতা হিসেবে জনপ্রিয়তার স্বর্ণ শিখরে পৌঁছে যায়। এবং ১৯৫৫ সালে একটি অসাম্প্রদায়িক দল গঠনের লক্ষ্যে "আওয়ামী লীগ" এর সূচনা করেন।

১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলা:

পশ্চিম পাকিস্থানের শাষক গোষ্ঠী সব সময় পূর্ব পাকিস্থানের প্রতি বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করে আসছিলো। তারা ধর্মীয় ভিত্তির উপর একটি রাষ্ট্র গঠন এর জোর প্রচেষ্টায় মত্ত ছিলো। অপরদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্ম নিরপেক্ষ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ গঠনের জোর প্রচেষ্টা চালান। তিনি বিভিন্ন বিদেশি কূটনীতিকদের সাথে মিটিং করেন।

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে পাকিস্থান সরকার তাঁর নামে মামলার অভিযোগ দায়ের করেন। এই মামলার পূর্ণনাম ছিল "রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য" যা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামেও পরিচিত ছিল। মামলার অভিযোগনামায় উল্লেখ করা হয়-

"অভিযুক্তরা ভারতীয় অস্ত্র ও অর্থের সাহায্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটিয়ে কেন্দ্র থেকে পূর্ব পাকিস্থানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছিল"।

১৯৬৯ সালে গনঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার ৪ যুগ পর মামলার আসামী ক্যাপ্টেন এ শওকত আলী ২০১১ সালে প্রকাশিত স্বরচিত একটি গ্রন্থে এ মামলাকে সত্য বলে দাবী করেন। তাই বলা যায় আগরতলা মামলার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় বঙ্গবন্ধু তখন থেকেই একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের স্বপ্ন লালন করতেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ফলাফল:

বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দর্শনকে মানুষ মনে প্রাণে ধারণ করেছিলো। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা, ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন তার প্রমাণ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ মনে প্রাণে গ্রহণ করে তাই ১৯৭০ সালে নিরঙ্কুশ ভোটে বঙ্গবন্ধুকে নির্বাচিত করে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য 'বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ' এর ধারণা দেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ এই জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করে রায় দেয়। এই নির্বাচনের ফলে যে দিকগুলো পরিস্ফুটিত হয়েছে সেগুলো হলো-

- বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উত্থান।
- অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রতি জন সমর্থন।
- শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
- স্বাধীন সার্বভৌম ও ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠনের পক্ষে রায় প্রদান।
- বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের লালিত এক সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন ও সংবিধান প্রণয়ন:

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর ৩০ লক্ষ শহিদ ও ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রম এর বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ভাষণের মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতি, ধর্ম বর্ণ, মতভেদ ভুলে নির্বিশেষে সকলকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ প্রদান করেন। ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। এই মহান মুক্তিযুদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনার উপর ভিত্তি করে সংগঠিত হয়। বঙ্গবন্ধুর ডাকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান, ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠি ইত্যাদি নানা মতের, নানান পেশার মানুষ সাড়া দেয়। এটিই ছিলো বঙ্গবন্ধুর লালিত একটি স্বপ্ন "অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ" গড়ে তোলা।

১৯৭২ সালের সংবিধান প্রণয়ন:

স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে একটি সংবিধান প্রনয়ন করেন। এ সংবিধানে মূলনীতি হিসেবে রাখা হয়

- ধর্মনিরপেক্ষতা
- গণতন্ত্র

- সমাজতন্ত্র
- জাতীয়তাবাদ

এ মূলনীতিই বঙ্গবন্ধুর "অসাম্প্রদায়িক চেতনার" প্রতিফলন।

বঙ্গবন্ধুর বাণীতে অসাম্প্রদায়িক চেতনাঃ

বঙ্গবন্ধু তাঁর বিখ্যাত উক্তি ও বাণীতে "অসাম্প্রদায়িক চেতনার" প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। নিচে তাঁর উল্লেখযোগ্য বাণীগুলোর কয়েকটি দেয়া হলো-

❖ "আর যেন সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান প্রত্যেককে তার নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।"- *(বঙ্গবন্ধু ১৭৭২)*

❖ "বাঙ্গালী হওয়ার সাথে ধর্মে মুসলমান থাকার কোন বিরোধ নেই। একটি আমার ধর্ম অন্যটি জাতি পরিচয়। ধর্ম আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচার। জাতি পরিচয় আমার সমষ্টিগত ঐতিহ্য"। - *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*

ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে অসাম্প্রদায়িক চেতনাঃ

পৃথিবীর সকল ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। প্রতিটি ধর্মই শান্তি ও কল্যাণের বার্তা দেয়। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প কোন ধর্মের বিশ্বাস হতে পারে না। ইসলাম ধর্মেও অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে নির্দেশ প্রদান করেছে।তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোন থেকে অসাম্প্রদায়িকতা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বরং ভ্রান্ত ও বর্জিত।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা বাস্তবায়নে করণীয়ঃ

বাঙালি জাতির মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে অসাম্প্রদায়িক চেতনা লালন করতেন তা বাস্তবায়নে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের করণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। সেগুলো হলো-

- ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তুলতে হবে।
- সকলের প্রতি সহনশীল আচরণ করতে হবে।
- মানুষকে তার ধর্ম, বর্ণ, জাত ইত্যাদির বিচারে না দেখে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে দেখা।
- সঠিক ও পর্যাপ্ত ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করা।
- উগ্র ধর্মীয় গোষ্টির (হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান) উত্থান প্রতিরোধ করা।
- সকল বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব। সেই সাথে বঙ্গবন্ধুর প্রবর্তিত সংবিধান কার্যকর করার মাধ্যমে সুখী,সমৃদ্ধ শান্তিপূর্ণ, ধর্ম নিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলে বঙ্গবন্ধুর "অসাম্প্রদায়িক চেতনা" বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

উপসংহার :

"The poet of Politics" খ্যাত বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন উদার ধর্ম নিরপেক্ষ সাম্যভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের মহানায়ক। তিনি তাঁর দর্শন দ্বারা মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দেশ পরিচালনায় শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন বলে তাকে বিশ্ব শান্তি পরিষদ "জুলিও কুরি" পুরস্কারে ভূষিত করে। পুরস্কার প্রদান করার সময় সংস্থার মহাসচিব রমেশ চন্দ্র তাকে 'বিশ্ববন্ধু' আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন দেশের সব মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে নির্যাতিত, নিপীড়িত, দুঃখী মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু এক বাতিঘরের নাম। পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে হলে দেশের প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে তাঁর জীবনাদর্শ লালন করতে হবে। সকলে হাতে হাত রেখে কাঁধে কাঁধ রেখে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি ও মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক "বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা" মনে প্রাণে লালন করে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে।

"বঙ্গবন্ধু, অসাম্প্রদায়িক চেতনার আরেক নাম"

যুথিকা সরকার
বি.এড, রোল: ৬৮, শিক্ষাবর্ষ-২০২১

ভূমিকা:

যে নামটি বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তা হলো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৭ মার্চ ১৯২০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার টঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি "শেখ মুজিব" এবং "শেখ সাহেব" হিসাবে বেশি পরিচিত এবং তাঁর উপাধি "বঙ্গবন্ধু"। আর এই মহান নেতার কণ্ঠে বিভিন্ন সময় দেশের গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক সমঝোতা ও সহনশীলতা, দুর্নীতিসহ নানা বিষয়ে যে কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে, তা এখনো যেন প্রাসঙ্গিক।

সাম্প্রতিক সম্প্রীতি:

সৃষ্টিতত্ত্বে মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নেই। আকৃতি- প্রকৃতি, সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আহার-বিশ্রামের অনুভূতিতে সব মানুষ অভিন্ন। মানুষের একমাত্র পরিচয় হলো সে মানুষ। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নয়" মানুষ এই সত্যকে ভুলে কৃত্রিম জাতি ও ঘৃণ্য জাতি ভেদাভেদ তৈরি করেছে আর গড়ে তুলেছে বিভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। কিন্তু সেই অসংখ্য বর্ণ বৈচিত্রের মাঝে অতীতে মতো আজও মানুষ বহন করে চলেছে এক ও অভিন্ন রক্ত এবং মানব ঐতিহ্য। তাই তো বঙ্গবন্ধু বলেছেন,

"মানুষকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা না করে ধর্ম, বর্ণ ও জাতি গোত্র ইত্যাদি দিয়ে পার্থক্য দেখাই সাম্প্রদায়িকতা। পৃথিবীর সকল ধর্মের মূল কথা প্রেম, মৈত্রী, শান্তি ও সম্প্রীতি। এই শিক্ষা থেকে সরে এসে সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ মানুষকে পশুতে পরিণত করতে পারে। বিশ্বে শুধু সাম্প্রদায়িকতার কারণে হাজার হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। দারুণভাবে লজ্জিত হচ্ছে মানবতা। সাম্প্রদায়িকতা তাই মানুষের যুগ-যুগান্তের অভিশাপ।

সাম্প্রদায়িকতার সূচনা:

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের সূচনা পর্বে কোন ধর্ম, বর্ণ-জাতি ভেদাভেদ ছিল না। পরবর্তীতে মানুষ যখন সমাজ, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করল আত্মস্বার্থের কারণে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, জাতি, গোত্র ইত্যাদির প্রকাশ ঘটল। জাতি বিদ্বেষের তীব্র বিষ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে, দেশে দেশে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে হয়েছিল দাঙ্গা।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা:

লাখ শহীদের রক্তের দাগ লেগে আছে তা ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে যেমন বিহিত সম্ভব নয়, তেমনি বাংলাদেশের আকাশে বাতাসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। আড়াই লাখেরও বেশি নারীর নির্যাতন ও নিপীড়নের যে হাহাকারের আর্তনাদ ভেসে ওঠে তাও সম্প্রদায় নির্বিশেষে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। তাই রচিত হয়েছে অসাম্প্রদায়িক চেতনার এক অমীয় সঙ্গীত-

"চাষাদের মুটেদের মুজুরের, গরীবের নিঃস্বের
ফকিরের, আমারই দেশ সব মানুষের।"

সাম্প্রদায়িক অপশক্তি:

বঙ্গবন্ধু বরাবরই এদেশের সাম্প্রদায়িক অপশক্তির ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। সাম্প্রদায়িক ঘটনার পেছনে নানা ষড়যন্ত্র কাজ করে, এ ব্যাপারেও তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধূলিসাৎ করে কেউ যেন বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন না করতে পারে।

ধর্মীয় সংকীর্ণতা:

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব রকম গোড়ামি, অন্ধত্ব ও কূপমন্ডুকতামুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন

সব সম্প্রদায়ের মানুষের এক মহান বন্ধু। ধর্মীয় সংকীর্ণতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। রাজনৈতিক জীবনে ও ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেননি। মানুষ বেঁচে থাকে তার কর্মের মাঝে, বয়স আয়ুর মধ্যে নয়। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। আর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে কর্ম দ্বারা।

সাম্প্রদায়িক কুফল:

সাম্প্রদায়িকতা দেয়নি কিছুই, বরং করেছে অনেক ক্ষতি। বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনার মর্ম উপলব্ধির মাধ্যমেই সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করতে হবে। সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উপাসনালয় সাম্প্রদায়িক ক্রোধের আগুনে পুড়তে দেখি তখন আমরা বিমর্ষ বোধ করি। সাম্প্রদায়িক ক্রোধ ও ঘৃণার এই বীভৎস রূপ বঙ্গবন্ধু চিন্তাও করেননি। যা সাম্প্রদায়িকতা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় উন্নতির অন্তরায়। মানুষের সভ্য, সুস্থ ও শান্তিময় জীবনকে নষ্ট করে। মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। জাতি বিদ্বেষ, বর্ণ বিদ্বেষ থেকেও পৃথিবীর বহু জাতি, রাষ্ট্র যুদ্ধ করে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ভারত, পাকিস্তান, বসনিয়া, মায়ানমার প্রভৃতি দেশে সহিংসতা চলছে।

"যার মনের মধ্যে আছে সাম্প্রদায়িকতা
সে হলো বন্য জীবের সমতুল্য"।

অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক বঙ্গবন্ধু:

বঙ্গবন্ধুর সারা জীবনের রাজনীতি সাধনার মূলে অন্যতম আদর্শ ছিল অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবাদ। ব্যক্তি মানুষ হিসেবে তিনি ইসলাম ধর্মের অনুসারী হলেও সর্ব ধর্মের মানুষের প্রতি ছিল সমান ভালবাসা। সেখানে বিশ্বমানবতাবোধ তাঁকে তাড়িত করেছে। তাই তো জাতির পিতা বলেছেন, "রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করে, যারা সাম্প্রদায়িক তার হীন, নীচ, তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালবাসে কোনদিন সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। যে মানুষটি মাত্র ৫৫ বছরের জীবনে ৩০৫৩ দিন কারা ভোগ করেন, ব্যক্তিগত কোন অপরাধে নয়। বারবর তিনি কারাগারে গেছেন মানুষের কথা বলতে গিয়ে, দেশের কথা বলতে গিয়ে, জাতির কথা বলতে গিয়ে একটা জাতির মুক্তির জন্য একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য খুন করা হলো পঁচাত্তরের ১৫ই আগষ্টে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধূলিসাৎ করার ষড়যন্ত্র। কিন্তু ঘাতকের কোন আদর্শ থাকতে পারে না। তাই তারা বেছে নিয়েছে এই অন্ধকার পথ। কাপুরুষের মতো ঘাতকরা মানবতাবিরোধী এ অপরাধ করেছে। তারা ভেবেছিল, তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তাঁর রাজনীতির দর্শন ধ্বংস করা যাবে। কিন্তু তা হয়নি। কারণ-

"যখন ঝিলে পদ্ম ফোটে, সন্ধ্যা নামে রাখাল ছোটে
গৃহের পানে,
তখন বাঁশির সুরে সুরে, তাকাই ফিরে অন্তঃপুরে
চোখের টানে
দেখি হিজল তমাল গাছে, তোমার একটি আছে"।

বঙ্গবন্ধু সর্বত্র, সারা দেশের প্রত্যেক মানুষের বুকে খচিত এক নাম। কোথায় নেই তিনি।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শের মৃত্যু নেই:

মানুষকে হত্যা করা যায়। তিনি তাঁর দর্শন নীতি ও আদর্শকে হত্যা করা যায় না। বঙ্গবন্ধুর জীবনে সততাই ছিল মূল চালিকা শক্তি। সততার শিক্ষা পেয়েছেন পরিবার থেকেই। সারা জীবনে তিনি বাবার মতোই সততার অনুশীলন করেছেন। রাজনীতিতে কখনও মিথ্যা, ভণ্ডামির আশ্রয় নেননি। বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী নেতা। বঙ্গবন্ধু সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ভাষা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ধাপে ধাপে স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের অবিস্মরণীয় উপাদানে পরিণত হয়। ১৯ মিনিটের এ ভাষণ যুগ সৃষ্টিকারী ও বিশ্বের অন্যতম সেরা ভাষণ। তাঁর নেতৃত্ব, আদর্শ ও নীতির প্রতি জনগনের আস্থা ছিল শতভাগ। যে কারণে প্রতিটি মানুষ নিজেকে বিপ্লবী হিসেবে তৈরি করেন। তাঁর ডাকেই সাড়া দিয়েই জনগন দীর্ঘ নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ইতিহাসে তিনিই অমর, যিনি তার স্বপ্নের বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করেন এবং জাতিকে স্বপ্ন দেখান। ইতিহাস তাকে সৃষ্টি করেনি। তিনিই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। বঙ্গবন্ধু সেই ইতিহাসের মহামানব। তিনি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম ও কর্মের মধ্য দিয়ে যে দর্শন, নীতি ও আদর্শ আমাদের সমানে রেখে গেছেন তাকে অনুসরণ করেই

আমাদের এগিয়ে হবে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণ করলেই একজন ব্যক্তি সুনাগরিক ও আদর্শ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তাই তিনি বলেছেন,

"নেতার মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু সংগঠন বেঁচে থাকলে আদর্শের মৃত্যু নেই"।

বঙ্গবন্ধু ও ধর্মনিরপেক্ষতা:

শেখ মুজিবুর রহমান রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনী পাঠ করলে আমরা জানতে পারব যে, মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও অন্য সব ধর্মের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল শোষণহীন রাষ্ট্র ও সমাজ গড়ে তোলা। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ভাষণে তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তি ছিল অনিবার্য। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্র পরিচালনার একটি নীতি আর এই নীতিকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করবে। পূর্ণ নিরপেক্ষতা ছাড়া পক্ষপাতহীন ন্যায় বিচার করা যে সম্ভব নয় তা বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ৪৬ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যাশা বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা যেন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়। বঙ্গবন্ধুর নীতি ও আদর্শ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে রাষ্ট্র ও দেশ হবে সুখি, সমৃদ্ধ ও নিরাপদ তাই তো আজও শোনা যায়,

"মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু- মুসলমান
মুসলিম তার নয়ন-মনি, হিন্দু তার প্রাণ"।
এক সে আকাশ মায়ের কোলে, যেন রবি শশী দোলে
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান"।

বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ:

দেশের তরে, দেশের মানুষের তরে নিজের পুরো জীবনটাই সমর্পন করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এদেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে নিজের জীবনের একটা বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন কারাগারে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ চিরকাল এক ও অভিন্ন হয়েই থাকবে। এদেশের শিশু-যুবক-বৃদ্ধ সবাই গর্ব ভরে লিখে যাবে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কথা। তাই কবি যথার্থই বলেছেন-

"যতকাল রবে পদ্মা-মেঘনা-গৌরী যমুনা বহমান,
ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান"

উপসংহার:

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে যার নাম উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্যমান তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দূরদর্শী, বিচক্ষণ এবং সঠিক নেতৃত্বেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। তিনি সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতির জনক। জেল-জুলুম ও নির্যাতনের কাছে কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেননি। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া বাঙালি জাতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করার শামিল। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ সমগ্র বাঙালি জাতির কাছে একও অভিন্ন নাম।

"তোমার স্বপ্নে পথ চলি আজো
চেতনায় মহীয়ান।
মুজিব তোমার অমিত সাহসে
জেগে আছে কোটি প্রাণ"।

বঙ্গবন্ধুর মানস, অসাম্প্রদায়ের তীর্থভূমি

ঊর্মি অরুনা রায়
বিএড, রোল: ২৬, শিক্ষাবর্ষ-২০২১

ভূমিকাঃ

বঙ্গবন্ধু। একটি নাম, একটি চেতনা, একটি স্বপ্ন। যে চেতনা, লালন করে এক সমৃদ্ধ দেশের স্বাধীন মানচিত্রের। যে স্বপ্ন এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের। বঙ্গবন্ধু এক শাণিত কন্ঠস্বর। যার প্রত্যেক ধ্বনিতে শিহরিত হয় এদেশের মানুষের হৃদয়। তারা জ্বলে ওঠার শক্তি পায়, তারা জ্বলে ওঠে। স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। এরপর আবার বঙ্গবন্ধু। যে নেতৃত্ব হাল ধরে এক ভগ্ন দেশের। টেনে তোলে মানুষের নতুন করে বাঁচার স্বপ্নকে। বাঙ্গালীরা যেন আবার জেগে ওঠার সাহস পায়। সকল ধনী, গরীব, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রীস্টান সকলেই সেই হাত ধরে ঘুরে দাঁড়ায় আর নতুন অবকাঠামো নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ। সেই তো বঙ্গবন্ধু। যিনি আমাদের শিখিয়েছেন মানুষকে মানুষ ভাবতে। ব্যক্তিগত পরিচয় আমার যাই হোক, দিন শেষে আমি বাঙালী, আমি মানুষ। আর এটাই তো সেই চেতনা, যা বঙ্গবন্ধু আমাদের হৃদয়ে রোপণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিঃ

অসাম্প্রদায়িকতাই ছিল বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি। বঙ্গবন্ধু একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ইসলামের প্রতি ছিল তার পরম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ। তিনি পরিপূর্ণরূপে ইসলামের অনুগত ছিলেন বলেই হয়ত তাঁর রাজনৈতিক দর্শনে সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মীয় সংঘাতের সুযোগ ছিল না। বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় তিনি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান এই চার সম্প্রদায়কে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। যা একজন সুশাসকের সবচেয়ে আদর্শ গুণ। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের ভাষায়, "বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িকতা পাশ্চাত্য ধারণার মত বিবর্জিত ছিল না। প্রত্যেক ধর্মের প্রতি ছিল তার শ্রদ্ধা"।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "ধর্ম নিরপেক্ষতা হলো প্রত্যেকের স্ব স্ব ধর্ম পালন করার অধিকার। রাষ্ট্রের ব্যাপারে ধর্ম কোন হস্তক্ষেপ করবে না, আর ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র থাকবে নির্লিপ্ত। সকলকে তিনি বাঙ্গালী হিসেবে দেখতেন। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তার পক্ষে রাজনৈতিক অঙ্গণে সকল বাঙ্গালীকে একীভূত করা সম্ভব হয়েছিল। সকল বাঙ্গালীকে সাথে নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান তিনি। তাই তার ৬ দফা হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সকলকে ধর্মীয় বিরোধ উপেক্ষা করে এক হতে সাহায্য করে। এ কারণেই ৭০ এর নির্বাচনে এক অবিশ্বাস্য ফল দেখা যায়। সে কারণেই বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতার পটভূমি রচিত হয়।

তিনি স্পষ্টভাবে জানতেন যে, ধর্মীয় বিরোধের কারণেই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয় তাই ধর্মীয় বিরোধ দূর করার জন্য তিনি সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে চার নীতির অন্তর্ভুক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনে অসাম্প্রদায়িকতা ছিল এক মহানুভবতার স্বস্তিকা চিহ্ন। আর এজন্যই বাংলার মানুষ তাঁর ওপর আস্থা করেছিলেন এবং দেশ স্বাধীন হয়েছিল। অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এমন নেতা বিশ্বে বিরল। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি তাঁর জীবনের রাজনৈতিক সফলতার মূল কারণ।

অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী বঙ্গবন্ধুঃ

বাঙ্গালী জাতির জন্য বঙ্গবন্ধুর অবদান ও আত্মত্যাগ যেমন তাকে জাতির পিতার আসনে সম্মানিত করেছে তেমনি অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী রাজনৈতিক দর্শন তাকে বিশ্বসভায় স্থান করে দিয়েছেন বিশ্ব মানবতার প্রতীক রূপে।

মুক্তিকামী, নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বঙ্গবন্ধু। তার রাজনৈতিক দর্শন বিশ্ব মহলে ছিলো এক প্রশংসনীয় আদর্শ। এজন্য যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ উইক পত্রিকার শিরোনামে বঙ্গবন্ধুকে অভিহিত করা হয় "রাজনীতির কবি" নামে।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী চেতনা। মানুষকে আপন করে নেয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। যদিও তাঁর এই অসাম্প্রদায়িক চেতনার মূলে ছিলেন তাঁর পিতার আদর্শ। অর্থাৎ তিনি তাঁর পিতারও আদর্শ সন্তান ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু কখনও নিজের জীবনের কথা ভাবেননি। জীবনের সকল মূহুর্তগুলো উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন এদেশের আপামর জনসাধারণের জন্য। শত শত বিপদ উপেক্ষা করে তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষের সামনে দাঁড়িয়েছেন মুক্তির দিশা হয়ে। সন্তানের মত আগলে রেখেছেন। তাঁর মত ত্যাগী নেতা এদেশের তথা বিশ্বের রাজনীতিতে বিরল।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল এদেশের জনগন। কোন বিশেষ গোষ্ঠী নয়। এদেশের জনগনের অধিকার আদায়, বৈষম্য সরিয়ে সাম্য প্রতিষ্ঠা, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার শিকড় উপড়িয়ে অসাম্প্রদায়িক জাতি গঠন ছিল তাঁর লড়াই

ও সংগ্রামী রাজনীতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ধর্ম, বর্ণ, জাত পাত এ সবের তোয়াক্কা না করে মন প্রাণ উজাড় করে এদেশের মানুষের প্রতি তার যে ভালবাসা ছিল সেটিই হল অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও মানবতার বড় দৃষ্টান্ত। তিনি যেখানে যেতেন সেখানে সকলকে ভাইয়েরা আমার বলে সকলকে সম্বোধন করতেন। "ভাই" সম্বোধন দিয়ে তিনি কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে নয়, এদেশের ধনী, গরীব, বড়, ছোট এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে বোঝাতেন। এই উদার মানসিকতা ও বোধ বঙ্গবন্ধুর রক্তে, মস্তিষ্কে ও শিরায় শিরায় প্রবাহিত হত।

বঙ্গবন্ধুরধর্ম সম্বন্ধীয় উক্তি:

শেখ মুজিব সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক তবে সাম্প্রদায়িকতা পছন্দ করতেন না। কারণ যিনি প্রকৃত ধার্মিক তিনি কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না। ইসলাম ধর্ম সেই শিক্ষা দেয় না। অন্য ধর্ম ও মানুষের প্রতি সহনশীলতা ও ভালবাসাই একজন ধার্মিকের আসল গুণ।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। সকল ধর্মের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে। কেউ কাউকে বাঁধা দিতে পারবে না। আমাদের শুধু আপত্তি এই যে, ধর্মকে কেউ রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে না। ২৫ বছর আমরা দেখেছি, ধর্মের নামে জুয়াচুরি, ধর্মের নামে শোষণ, ধর্মের নামে বেঈমানী, ধর্মের নামে অত্যাচার, খুন ব্যভিচার এই বাংলাদেশের মাটিতে চলেছে। ধর্ম অতি পবিত্র জিনিস। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার চলবে না"।

তিনি পবিত্র ধর্মকে সব সময় রাজনীতির বাইরে রাখতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি জানতেন, ধর্ম রাজনীতির জন্য নয়। ধর্ম হলো মানুষের পরিশুদ্ধির জন্য।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব রকম ধর্মীয় গোঁড়ামী, অন্ধত্ব ও কূপমণ্ডুকতামুক্ত ছিলেন। তিনি ধার্মিক পিতামাতার সন্তান ছিলেন এবং নিজেও ধার্মিক ছিলেন। কিন্তু ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না।

বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় দৃঢ়তা এত প্রখর ছিল তা বোঝা যায়, সৌদি বাদশাহ্ ফয়সালের সাথে তাঁর কথোপকথনে। বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত সত্তাকে জানতে তার আংশিক তুলে ধরা হল-

"**বাদশাহ্ ফয়সাল:** আপনারা কিংডম অব সৌদি আরাবিয়ার কাছ থেকে কি চাইছেন?

বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের পরহেজগার মুসলমানরা পবিত্র কাবা শরীফে নামাজ আদায়ের অধিকার চাইছে। এক্সেলেন্সি, আপনিই বলুন সেখানে তো কোন শর্ত থাকতে পারে না? আপনি হচ্ছেন পবিত্র কাবা শরীফের হেফাজতকারী। এখানে দুনিয়ার সব মুসলমানের নামাজ আদায় করার হক আছে। আমরা আপনার কাছে ভ্রাতৃসুলভ সমান ব্যবহার প্রত্যাশা করছি।

ফয়সাল: এসব তো রাজনৈতিক কথাবার্তা হল না। এক্সেলেন্সি বলুন, আপনারা কিংডম অব সৌদি আরাবিয়ার কাছ থেকে কী চাইছেন আসলে?

শেখ মুজিব: এক্সেলেন্সি, আপনি জানেন, ইন্দোনেশিয়ার পর বাংলাদেশ হল দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ। তাই আমি জানতে চাইছি কেন সৌদি আরব আজ পর্যন্ত স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না?

ফয়সাল: আমি করুণাময় আল্লাহ ছাড়া আর কারও কাছে জবাবদিহি করি না। তবু আপনি একজন মুসলমান তাই বলছি, সৌদি আরবের স্বীকৃতি পেতে হলে বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক' করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু: বাংলাদেশের জন্য এটি প্রযোজ্য হতে পারে না। বিশ্বের দ্বিতীয় মুসলিম জনসংখ্যার দেশ হলেও এখানে এক কোটির উপর অমুসলিম রয়েছে। সবাই একসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে। তাছাড়া এক্সেলেন্সি, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে পরম করুণাময় আল্লাহ তো শুধু "আল মুসলিমিন" না, তিনি রাব্বুল আলামিন, সবার স্রষ্টা। ক্ষমা করবেন, আপনাদের দেশের নাম তো "ইসলামিক রিপাবলিক অব সৌদি আরাবিয়া" নয়। বরং মরহুম বাদশাহ্ ইবনে সৌদ এর সম্মানে "কিংডম অব সৌদি আরাবিয়া" কই আমরা তো কেউ এ নামে আপত্তি করিনি। (সূত্র: বঙ্গবন্ধুর নীতি নৈতিকতা, হাসান খোরশেদ)।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী ভাষণে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন "রাজনীতিতে যারা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে, যারা সম্প্রসায়িদক তারা হীন, নিচ তাদের অন্তর ছোট। যে মানুষকে ভালবাসে সে কখনও সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। আপনারা যারা এখানে মুসলমান আছেন তারা জানেন যে, খোদা যিনি আছেন তিনি রাব্বুল আলামিন। রাব্বুল মুসলিমিন নন। হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, খ্রিস্টান হোক বা বৌদ্ধ হোক সব মানুষ তার কাছে সমান। সে জন্যই এক মুখে সোশ্যালিজম ও প্রগতির কথা আরেক মুখে সাম্প্রদায়িকতা পাশাপাশি চলতে পারে না। একটা হচ্ছে পশ্চিম। যারা এ বাংলার মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা করতে চায়, তাদের সম্পর্কে সাবধান হয়ে

যাও। আওয়ামী লীগের কর্মীরা, তোমরা কোনদিন সাম্প্রদায়িকতাকে পছন্দ করো নাই। তোমরা জীবনভর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছ। তোমাদের জীবন থাকতে যেন বাংলার মাটিতে আর কেউ সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে না পারে।

বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাজনৈতিক দৃঢ়তা:

বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান আন্দোলনের ১ম সারির কর্মী ছিলেন। কিন্তু সেখানে তার অসাম্প্রদায়িক অবস্থান আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পারি। তিনি মনে করতেন, হিন্দু জমিদারির বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে খেটে খাওয়া চাষি মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। আবার যখন দেখেছেন, মুসলিম লীগের শাসনামলে হিন্দু জমিদারদের বদলে মুসলিম জোতদের, নবাবদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। তখনই তিনি মুসলিম লীগের বিকল্প রাজনৈতিক দল গঠনের ভেবেছে। মাঠে নেমেছেন মওলানা ভাসানীর সঙ্গে। প্রথম দিকে দলের নাম "আওয়ামী মুসলিম লীগ" হলেও 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে ধর্ম নির্বিশেষে সবার দল আওয়ামী লীগ গড়ে তুলেছেন।

আবার, ষাটের দশকে ৬ দফার মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছিলেন মুসলিম বা হিন্দু নয়, পূর্ব বাংলার মানুষের একটাই পরিচয়। তারা বাঙালী। তাদের অধিকারের প্রশ্নে তাই কেবল অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক মুক্তি প্রয়োজন। একইভাবে বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টি যুক্ত করেন।

রাজনীতির কোন ক্ষেত্রে তিনি ধর্মকে কখনও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেননি। ধর্ম শাশ্বত, ধর্ম পবিত্র এই বিশ্বাসকে তিনি লালন করতেন মনে প্রাণে। তিনি জানতেন ধর্ম রাজনীতি আমাদের দেশের জন্য নয়। এদেশের সকল মানুষ একটি ধর্ম পালন করে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এদেশে আর অন্য ধর্মের মানুষ বসবাস করে। এদেশের মূল চালিকা শক্তিকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে তাদের পৃথক বা তাদের অধিকার হনন করা যাবে না। তিনি সকলকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি হল দেশের মানুষের জন্য, তাদের মুক্তির জন্য, তাদের অধিকারের জন্য। অন্যদিকে ধর্ম হল মানুষের নিজস্ব শান্তির জন্য। হৃদয়কে নির্মল করার জন্য।

তিনি তার সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে ধর্মকে সর্বদা আলাদা ভাবে রেখেছেন। শুধু ধর্ম নয় বরং আলাদা আলাদা সংস্কৃতিকে ও তার অনুসারী মানুষদেরও তিনি সম সম্মান করে গেছেন ও করতে বলেছেন। তিনি জানতেন, এদেশটা সবার।

সংস্কৃতি মনা বঙ্গবন্ধু:

স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আপাদমস্তক একজন সংস্কৃতি প্রেমী ছিলেন। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির একজন উদার পৃষ্ঠপোষক। তিনি এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের এক মহানায়ক। বাংলার নদী, বাংলার জল, খাবার, গান, ফসলী জমি, এদের নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য তাকে সর্বদা মুগ্ধ করত। একটি দেশের সংস্কৃতি, সেই দেশে বসবাসকারী জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে। আর সংস্কৃতিক পরিচয় যে কোন দেশকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত করে তোলে। আমাদের দেশেও বিচিত্র গোষ্ঠীর লোকের বাস। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন এই সকল মানুষকে যদি আরও উৎসাহী করা হয় তাহলে তারাই এদেশকে কোন একদিন বিশ্বে উদ্ভাবিত করবে। সারা বিশ্ব জানতো আমাদের ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতি। আর এ জন্যই বঙ্গবন্ধু সবসময় সকল বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠী কে নিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃতি নিরপেক্ষতা এসকল বিষয়কে বঙ্গবন্ধু খুব যত্নে লালন করতেন।

বঙ্গবন্ধু আব্বাস উদ্দীনের ভাটিয়ালী গানশুনতে পছন্দ করতেন। তিনি নজরুলের গজল শুনতেন। এছাড়াও তার রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, জীবনানন্দ ও জসীমউদ্দীনের লেখা পড়তে পছন্দ করতেন। শুধু পছন্দই করতেন না, জীবনে তাই প্রত্যক্ষ্য লালন করতেন। মানুষের মনে উদারতা না হলে সে সংস্কৃতি মনা হয়ে ওঠে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ছিলেন এক উদার আকাশ। যে আকাশে সকলের বিচরণ ছিল অবাধ। কোন ছান সেখানে ছিল না।

বঙ্গবন্ধুর নান্দনিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, এদেশের সংবিধানের প্রচ্ছদ নকশা দেখলে। তিনি জয়নুল আবেদীনকে এ দায়িত্ব দেন যেন তা দেখলে দেশীয় মোটিভগুলো ছান পেতে পারে। তিনি শিল্পীদের থেকে এমন সব শিল্পকর্ম আশা করতেন যা এদেশের সব মানুষের কথা বলবে। এদেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে। তিনি ভালোবাসতেন এদেশের শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক সহ সকল পেশার মানুষের নিজস্বতাকে। যা কেবল এক অসাম্প্রদায়িক চেতনাকেই ধারণ করে।

উপসংহার:

বঙ্গবন্ধুর চেতনা মানে এক বিশাল সমৃদ্ধ সাগর। যে সাগরে আছে সুখ, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন আর অসাম্প্রদায়িক উদার মানবতা। আমরা যদি বাঙ্গালী হিসেবে শুধু তাঁর আদর্শকে ধারণ করি তাহলে গড়ে উঠবে সুখী বাংলাদেশ। আজকের তরুণ প্রজন্মকে যদি সত্যিই উদার ও দেশপ্রেমী হতে হয় তবে তা এমনি এমনি হবে না বরং আমাদের অনুসরণ করতে হবে। আদর্শ, তাঁর বাণী আমাদের জানতে হবে বঙ্গবন্ধুকে। উপলব্ধি করতে হবে তার দেশপ্রেমকে। প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হতে দেশ গড়ার কাজে। কোন সাম্প্রদায়িক অপশক্তি যেন দেশকে পেছনে টেনে নিতে না পারে। তবেই অর্জিত হবে বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত সোনার বাংলাদেশ।

আমাদের বন্ধু শেখ রাসেল

রায়েশা খাতুন
বিএড (অনার্স) ১ম সেমিস্টার, রোল: ২০

ভূমিকা:

ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যাবে অনেক বড় বড় ব্যক্তির নাম কিন্তু বিশ্ব সম্মোহনীদের নামের তালিকা জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান সর্বাগ্রে। তিনি স্বাধীন বাংলার স্থাপতি। তিনি মহিমাময় নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ভক্ত ছিলেন আর তাই তিনি তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের নামকরণ করেন শেখ রাসেল। শেখ রাসেল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অঞ্চলের ধানমন্ডিতে ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে রাসেল সর্বকনিষ্ঠ। ভাইবোনের মধ্য একজন হলেন বাংলাদেশ এর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সংগঠক শেখ কামাল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ জামাল এবং বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ শেখ রেহানা। শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিলেন। শেখ রাসেল বঙ্গবন্ধু বংশের শুধু প্রদীপ নয়, সে ছিলো বাঙাল জাতির প্রদীপ এই বাংলার একটি নক্ষত্র। পুরো বাংলা জুড়ে আছে শেখ রাসেল নামক নক্ষত্র। তাকে নিয়ে বলা যায়-

রাসেল আছে বাংলা জুড়ে
ফুল ফসলের ভিড়ে
রাসেল আছে দুরন্ত সেই
মধুমতীর তীরে।

মাত্র ১১ বছর বয়সে নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া রাসেল হয়তো তার কর্মের দ্বারা বাঙালি জাতির ইতিহাস ও উত্থানে দাগ কেটে রেখে যেতে পারেনি, তবে তার কয়েক বৎসরের জীবন বাঙালি জাতির ইতিহাসকে এতই প্রভাবিত করেছে যে, কখন তিনি বঙ্গবন্ধু সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের সিংহাসন থেকে নেমে এসে আমাদের বন্ধু হয়ে উঠেছেন, তা আমরা বুঝতেই পারিনি।

শেখ রাসেলের জন্ম: তখন হেমন্তকাল, সময়টা ১৮ই অক্টোবর ১৯৬৪। নবান্নের নতুন ফসলের উৎসবে আগমন নতুন অতিথির। এ যেন বাঙালির আনন্দ, বাংলার আনন্দ। ধানমন্ডির সেই ঐতিহাসিক ও ভয়ানক ৩২ নং রোডের বাসায় 'শেখ হাসিনার' রুমেই রাত দেড়টার সময় রাসেলের জন্ম হয়। রাসেলের আগমনে পুরো বাড়ি জুড়ে বয়ে যায় আনন্দের জোয়ার। একটু বড় সড়ো হয়েছিলো শিশু রাসেল। জন্মের কিছুক্ষণ পর পরিবারের সবাইকে রাসেলের কথা জানানো হয়। পরে বোন শেখ হাসিনা এসে তার ওড়না দিয়ে ভেজা মাথা পরিষ্কার করে দেন। তখন শেখ হাসিনার আনন্দিত মন বলে ওঠে:

রাসেল আমার বন্ধু সুজন
রাসেল আমার ভাই,
আজ রাসেলের জন্মদিনে
শুভেচ্ছা জানাই।

রাসেলের নামকরণ:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী দার্শনিক ব্রার্টান্ড রাসেলের ভক্ত। তাঁর অনেক বই তিনি পড়েছেন। বার্ট্রান্ড রাসেল কেবলমাত্র একজন দার্শনিকই ছিলেন না বিজ্ঞানীও ছিলেন। বার্ট্রান্ড রাসেল ছিলেন পারমানবিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের বিশ্ব নেতাও। বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেল গঠন করেছিলেন "কমিটি অফ হান্ড্রেড"

রাসেলের জন্মের দু'বছর পূর্বেই ১৯৬২ সালে কিউবাকে কেন্দ্র করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কেনেডি এবং সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী ক্রুশেফ এর মধ্যে স্নায়ু ও কুটনৈতিক যুদ্ধ চলছিলো। যেটি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো, ঠিক তখনই বিশ্ব মানবতার প্রতীক হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল। আর তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর কনিষ্ঠপুত্রের নামকরণ করেন শেখ রাসেল।

প্রাথমিক জীবন:

শেখ রাসেল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অঞ্চলের ধানমন্ডিতে ৩২নং বঙ্গবন্ধু ভবনে ১৮ই অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে রাসেল সর্বকনিষ্ঠ। ভাই বোনের মধ্যে অন্য একজন হলেন বাংলাদেশের বর্তমান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ জামাল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিবীদ শেখ রেহানা। শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। শেখ রাসেলের ছেলেবেলা দেশের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতোই বর্ণময়। জন্মের পর খুব বেশি দিন তিনি বাবার সান্নিধ্য পাননি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে ঢাকা থাকলেও পরে পাকিস্তানে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। শোনা যায় বড় আপা শেখ হাসিনার সঙ্গে কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গিয়ে মাত্র দু'বছর বয়সের রাসেল তার আপাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন- তিনি বঙ্গবন্ধুকে বাবা বলে ডাকতে পারেন কিনা, সামান্য কিছুদিনের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই রাসেল কাটিয়েছিলেন তার মা ও বোনদের কাছে।

কেন শেখ রাসেল আমাদের বন্ধু:

শেখ রাসেল কেন আমাদের বন্ধু, কীভাবেই বা তিনি আমাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে রাসেলের ছোটবেলার দিনগুলিতে। তার ছেলেবেলার দিনগুলো সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তার অধিকাংশই শিশু বয়সের নিষ্পাপ আত্মভোলা কর্মকান্ড। শোনা যায় বঙ্গবন্ধুর বাসায় টমি নামের একটি কুকুর ছিলো যার সাথে ছোট্ট রাসেল খেলে বেড়াতো। একদিন খেলার সময় কুকুরটি জোরে ডেকে উঠলে ছোট রাসেলের মনে হয় টমি তাকে বকেছে। শিশু রাসেল তার আপা রেহানার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন। আরো শোনা যায় রাসেলের মাছ ধরার খুব শখ ছিলো। মাছ ধরে আবার সেই মাছ সে পুকুরেই ছেড়ে দিত। এই ছিলো তার মজা। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র জয়ের জন্ম হলে রাসেল জয়কে নিয়ে খেলতো সারাদিন। তার স্বভাব ছিলো অত্যন্ত দুরন্ত প্রকৃতির। আর এই দুরন্তপনার সঙ্গি ছিলো একটি বাই সাইকেল। রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ভেঙে সেই বাই সাইকেল সঙ্গী করে রোজ স্কুলে যেত রাসেল। রাসেলের শৈশব আখ্যান যেন আমাদের সকলের শৈশবের গল্প বলে দেয়। তার শৈশবের গল্প কথাগুলির মধ্যে আমরা যেন বারবার নিজেদেরকেই খুঁজে পাই। পড়াশোনা, খেলাধুলা, দুরন্তপনা এসব নিয়ে রাসেল আমাদের সকলের কাছেই হয়ে ওঠে শৈশবের এক মূর্ত প্রতিমূর্তি। পরিশেষে বলা যায় যে, তার সকল প্রাণির প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসাই তাকে করেছে আমাদের সকলের বন্ধু।

নির্মম হত্যাকান্ড:

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সেই অভিশপ্ত রাতের সঙ্গে পরিচিতি আমাদের সকলেরই রয়েছে। সেই রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্মম পরিণতির কথা আমরা সকলেই কম বেশি জানি। একদল তরুন সেনা কর্মকর্তা সেই দিন রাতে শেখ মুজিবের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন ট্যাংক দিয়ে ঘিরে ফেলেন। সেইদিন প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়। শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত কর্মচারী মহিতুল ইসলামের কথা অনুযায়ী, রাসেল দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন, জানতে চান সেনারা তাকেও মারবে কিনা। এমতাবস্থায় একজন সেনা কর্মকর্তা মহিতুলকে এসে মারলে রাসেল তাকে ছেড়ে দেয়। সে কাঁদতে থাকে। মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য। সেই সময় একজন ঘাতক রাসেলকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে হত্যা করে। ঝড়ে যায় তাজা একটি প্রাণ।

"শেখ রাসেল"
আলো ছড়ানোর আগেই
যার জীবনে নেমে আসে
অন্ধকার।

উপসংহার:

শেখ রাসেল বাঙালি জাতির কাছে এক যুগোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতি তার মধ্যে খুঁজে পায় রূপকথার মতো নিজেদের ছেলে বেলাকে। শেখ রাসেলের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকে আপনার বাঙালির শৈশব। অন্যদিকে তার নির্মম মৃত্যুর কাহিনী বারবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের করুণ ইতিহাসের কথা। সেই সমস্ত নৃশংস ক্ষমতালোভী মানুষের কথা, যারা কেবলমাত্র ক্ষমতার লোভে ১১ বছরের একটি ছোট্ট শিশুকে অবধি রেহাই দেয়নি। যে জাতি নিজের ইতিহাস থেকে বিস্মৃত হয়, তারা সভ্যতার ইতিহাসে হুবির হয়ে পড়ে। শেখ রাসেল বাঙালি জাতির সেই ইতিহাসের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তার স্মৃতিকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বংলাদেশে গঠন করা হয়েছে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ। শেখ রাসেলের নামে রাজধানী ঢাকার বুকে নামঙ্কিত হয়েছে একটি ক্রেটিং স্টেডিয়াম। এভাবেই চিরকাল শেখ রাসেল অমর হয়ে থাকবেন বাঙালি জাতির স্মৃতিতে। বাঙালি জাতি শেখ রাসেলের স্মৃতি বুকে নিয়ে তাকে বন্ধুর স্নেহের আসনে বসিয়ে সভ্যতার পথে আরো অগ্রসর হোক- এই কামনা করি।

আমাদের ভালোবাসার রাসেল

আঁখী বাড়ই
বি.এড অনার্স (১ম সেমিস্টার পুরাতন), রোল: ১২

ভূমিকা:

স্বাধীনতা দিবসে স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বীর পুত্র শেখ কামাল এবং শেখ জামালকে। তবে প্রায়ই যাকে আমরা ভুলে যাই তিনি হলেন ঐ একই পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। মাত্র ১১ বছর বয়সে নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া রাসেল হয়তো তার কর্মের দ্বারা বাঙালি জাতির ইতিহাস ও উত্থানে দাগ কেটে রেখে যেতে পারেনি, তবে তার কয়েক বৎসরের জীবন বাঙালি জাতির ইতিহাসকে এতই প্রভাবিত করেছে যে কখন তিনি বঙ্গবন্ধু সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের সিংহাসন থেকে নেমে এসে আমাদের বন্ধু হয়ে উঠেছেন তা আমরা বুঝতে পারি নি।

শেখ রাসেলের জন্ম:

শেখ রাসেলের জন্মের ইতিহাস বড়ই সুন্দর। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ। দেশ তখন ভরা হেমন্তের গন্ধে আকুল হয়ে আছে। গ্রাম্য সভ্যতা ভিত্তিক আমাদের দেশের ঘরে ঘরে তখন নতুন ফসল তোলার আনন্দ। এমনই আনন্দের দিনে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় জন্মগ্রহণ করলেন শেখ রাসেল। তার জন্ম হয়েছিল বড় আপা শেখ হাসিনা ঘরে। সমগ্র বাড়ি জুড়ে সেদিন আনন্দের জোয়ার। জন্মের কিছুক্ষণ পর শেখ হাসিনার ওড়না দিয়ে বড় আপা তার ভেজা মাথা পরিষ্কার করে দেন। জন্মের সময় শেখ রাসেল চেহারায় ছিলেন স্বাস্থ্যবান। এ যেন শুধু বঙ্গবন্ধুর পরিবারেরই আনন্দ নয়, সমগ্র জাতির আনন্দ।

নামকরণ:

শেখ রাসেলের নামকরণের পেছনেও এক সুন্দর কাহিনী রয়েছে। বঙ্গবন্ধু বরাবরই ছিলেন বিশ্ব শান্তি ও সহাবস্থানের পক্ষপাতী এবং যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। এই সূত্রে তিনি বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের একজন গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় বার্ট্রান্ড রাসেল নোবেল বিজয়ী দার্শনিক কিংবা সমাজবিজ্ঞানীই ছিলেন না। ছিলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের নেতাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সমগ্র পৃথিবীর যখন সম্ভাব্য একটি পারমাণবিক যুদ্ধে আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হয়ে আছে, তখন যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম মুখ হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন বার্টান্ড রাসেল। এমনই মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তার কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখেন শেখ রাসেল।

ছেলেবেলা:

শেখ রাসেলের ছেলেবেলা দেশের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতোই বর্ণময়। জন্মের পর খুব বেশি দিন তিনি বাবার সান্নিধ্য পাননি। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। প্রথমে ঢাকায় থাকলেও পরে পাকিস্তানে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়। শোনা যায় বড় আপা শেখ হাসিনার সঙ্গে কারাগারে বঙ্গবন্ধুকে দেখতে গিয়ে দু বছর বয়সের রাসেল তার আপাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধুকে বাবা বলে ডাকতে পারবে কিনা? সামান্য কিছুদিনের জীবনের বেশিরভাগ সময়টাই রাসেল কাটিয়েছিলেন তার মা এবং বোনদের কাছে। তার পড়াশোনা শুরু হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজে। ১১ বছর বয়সে যখন তার মৃত্যু হয় তখন তিনি সেখানকারই চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

প্রাথমিক জীবন:

শেখ রাসেল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অঞ্চলের ধানমন্ডিতে ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে ১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে জন্মগ্রহণ করে। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে রাসেল সর্বকনিষ্ঠ। ভাই-বোনের মধ্যে অন্যরা হলেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর অন্যতম সংগঠক শেখ কামাল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা শেখ জামাল এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনীতিবিদ শেখ রেহানা। শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

কেন শেখ রাসেল আমাদের বন্ধু:

শেখ রাসেল কেন আমাদের বন্ধু, কীভাবেই বা তিনি আমাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে রাসেলের ছোটবেলার দিনগুলোতে। তার ছেলেবেলার দিনগুলোতে। তার ছেলেবেলার দিনগুলো সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তার অধিকাংশই শিশু বয়সের নিষ্পাপ আত্মভোলা কর্মকান্ড। শোনা যায় বঙ্গবন্ধুর বাসায় টমি নামে একটি কুকুর জোরে ডেকে উঠলে ছোট রাসেলের মনে হয় টমি তাকে বকেছে। শিশু রাসেল তার আপা রেহানার কাছে এসে কাঁদতে থাকেন। আরো শোনা যায় রাসেলের মাছ ধরার খুব শখ ছিল।

নির্মম হত্যাকান্ড:

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট এর সেই অভিশপ্ত রাতের সঙ্গে পরিচিতি আমাদের সকলেরই রয়েছে। সেই রাতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নির্মম পরিণতির কথা আমরা সকলেই কম বেশি জানি। একদল তরুন সেনা কর্মকর্তা সেই দিন রাতে শেখ মুজিবের ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবন ট্যাংক দিয়ে ঘিরে ফেলেন। সেইদিন প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু এবং ব্যক্তিগত কর্মচারীদের সাথে শেখ রাসেলকেও হত্যা করা হয়।

শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত কর্মচারী মহিতুল ইসলামের কথা অনুযায়ী, রাসেল দৌড়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেন, জানতে চান সেনারা তাকেও মারবে কিনা। এমতাবস্থায় একজন সেনা কর্মকর্তা মহিতুলকে এসে মারলে রাসেল তাকে ছেড়ে দেয়। সে কাঁদতে থাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই সময় ঘাতক রাসেলকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে হত্যা করে।

উপসংহার:

শেখ রাসেল বাঙালি জাতির কাছে এক যুগোত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। বাঙালি জাতি তার মধ্যে খুঁজে পায় রূপকথার মতো নিজেদের ছেলেবেলাকে। শেখ রাসেলের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে আপামর বাঙালির শৈশব। অন্যদিকে তার নির্মম মৃত্যুর কাহিনী বারবার মনে করিয়ে দেয় আমাদের দেশের করুন ইতিহাসের কথা। সেই সমস্ত নৃশংস ক্ষমতালোভী মানুষের কথা যারা কেবলমাত্র ক্ষমতার লোভে ১১ বছরের একটি ছোট শিশুকে অবধি রেহাই দেয়নি। যে জাতি নিজের ইতিহাসকে বিস্মৃত করে, তারা সভ্যতার ইতিহাসে ছবির হয়ে পড়ে। শেখ রাসেল বাঙালি জাতির সেই ইতিহাসের এক জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তার স্মৃতিকে চিরদিন বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই বাংলাদেশে গঠন করা হয়েছে শেখ রাসেল ক্রীড়া চক্র, শেখ রাসেল জাতীয় শিশু কিশোর পরিষদ। শেখ রাসেলের নামে রাজধানী ঢাকার বুকে নামাঙ্কিত হয়েছে ক্রেটিং স্টেডিয়াম। এভাবেই চিরকাল শেখ রাসেল অমর হয়ে থাকবেন বাঙালি জাতির স্মৃতিতে। বাঙালি জাতি শেখ রাসেলের স্মৃতি বুকে নিয়ে তাকে বন্ধুর স্নেহের আসনে বসিয়ে সভ্যতার পথে আরো অগ্রসর হোক- এই কামনা করি।

ছোটদের বন্ধু শেখ রাসেল

লোপা খাতুন
বিএড অনার্স (১ম সেমিস্টার), রোল নং: ২১

প্রারম্ভিকা: বাঙালি জাতির অন্দরমহল থেকে যুগে যুগে আবির্ভাব ঘটেছে অসংখ্য মহান ব্যক্তিত্বের। তাদের কাউকে বা আমরা যথাযথ সম্মান দিয়ে চিরকাল স্মরণ রেখেছি। আবার অনেকেই হারিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। তবে বাঙালি জাতি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, তার পেছনে কিছু না কিছু অবদান রয়েছে সেই সকল ব্যক্তিদেরই। তারা প্রত্যেকেই হয় তাদের জীবন দিয়ে কিংবা তাদের কর্ম দিয়ে বাঙালি জাতিকে যুগিয়ে গিয়েছেন মাথা তুলে দাঁড়ানোর রসদ। আমাদের দেশে বাঙালি জাতির প্রধান নেতা বললেই যে ব্যক্তির নাম সর্বপ্রথম মাথায় আসে তিনি "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"। ১৯৭৫ সালে সেনা অভ্যুত্থানে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুর নির্মম ও করুণ পরিণতির কথা আমরা সকলেই জানি। স্বাধীনতা দিবসে স্মরণ করি তার বীর পুত্র শেখ কামাল এবং শেখ জামালকে। তবে প্রায়শই যাকে আমরা ভুলে যাই তিনি হলেন ঐ একই পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য। বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেল। মাত্র ১১ বছর বয়সে নির্মম মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া শেখ রাসেল হয়তো তার কর্মের দ্বারা বাঙালি জাতির ইতিহাস ও উত্থানে দাগ কেটে রেখে যেতে পারেনি, তবে তার কয়েক বছরের জীবন বাঙালি জাতির ইতিহাসকে এতই প্রভাবিত করেছে যে কখন তিনি বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্রের সিংহাসন থেকে "আমাদের বন্ধু শেখ রাসেল" হয়ে উঠেছেন তা আমরা বুঝতেই পারিনি।

"শেখ রাসেল"
আলো ছড়ানোর আগেই
যার জীবনে নেমে আসে
অন্ধকার।

শেখ রাসেলের জন্ম: শেখ রাসেলের জন্মের ইতিহাস বড়ই সুন্দর। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসের ১৮ তারিখ। দেশ তখন ভরা হেমন্তের গন্ধে আকুল হয়ে আছে। গ্রাম্য সভ্যতাভিত্তিক আমাদের দেশের ঘরে ঘরে তখন নতুন ফসল তোলার আনন্দ। এমনই আনন্দের দিনে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডের বাসায় শেখ রাসেলের জন্ম হয়। তার জন্ম হয়েছিল বড় আপা শেখ হাসিনার ঘরে। জন্মের কিছুক্ষণ পর শেখ হাসিনা এসে তার ভেজা মাথা ওড়না দিয়ে পরিষ্কার করে দেন। রাসেল চেহারায় ছিলেন স্বাস্থ্যবান। এ যেন শুধু বঙ্গবন্ধুর পরিবারেই আনন্দ নয়, সমগ্র জাতির আনন্দ।

নামকরণ: শেখ রাসেলের নামকরণের পেছনেও এক সুন্দর কাহিনী রয়েছে। বঙ্গবন্ধু বরাবরই ছিলেন বিশ্বশান্তি ও সহবস্থানের এবং যুদ্ধের ঘোর বিরোধী। এই সূত্রে তিনি বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের একজন গুনমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়, বার্ট্রান্ড রাসেল নোবেল বিজয়ী দার্শনিক কিংবা সমাজ বিজ্ঞানীই ছিলেন না, ছিলেন আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের একজন বড় মাপের নেতাও। এমনই মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে অনুপ্রাণিত হয়ে বঙ্গবন্ধু তার কনিষ্ঠপুত্রের নাম রাখেন "শেখ রাসেল"।

শিক্ষাজীবন: শেখ রাসেল ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র ছিলেন। রাসেলের শিক্ষা জীবনের গুরুত্বপুর্ণ অংশ জুড়ে আছে তার গৃহশিক্ষক গীতালী দাসগুপ্তা। তিনি রাসেলকে প্রতিদিন পড়াতে আসতেন। তিনি গৌতমবুদ্ধ, মহানবী (সঃ) সহ অন্যান্য অনেক মহামানবের জীবনী তাকে শোনাতেন।

রাসেলের ছেলেবেলা: শেখ রাসেলের ছেলেবেলা দেশের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির মতোই বর্ণময়। জন্মের পর খুব বেশীদিন তিনি বাবার সান্নিধ্য পায়নি। মাঝে মাঝেই মাকে বাবা বলে ডাকতো। বাবাকে কাছে না পেলে কী আর করার? তখন তার বয়স মাত্র দশ বছর। ধরতে গেলে পৃথিবীর তেমন কিছুই দেখা হয়ে ওঠেনি তার, কেবল নিজের চারপাশ, একটা মুক্ত আকাশ আর মাথার উপর উড়ে যাওয়া পাখি ছাড়া। তার ছেলেবেলার দিনগুলো সম্পর্কে যেটুকু জানা যায় তার অধিকাংশই শিশু বয়সের নিষ্পাপ আত্মভোলা কর্মকান্ড। তার মা তাকে তিন চাকার একটি বাই সাইকেল কিনে দেন। রাসেলের মাছ ধরার খুব শখ ছিল। সে গণভবনে মাঝে মাঝে বর্শি নিয়ে মাছ ধরতে যেত। রাসেলের শৈশব আখ্যান যেন আমাদের সকলের শৈশবের গল্প বলে দেয়। তার শৈশবের গল্প কথাগুলির মধ্যে আমরা যেন বারবার নিজেদেরই খুঁজে পাই। তবে সে তার শৈশবটা আমাদের মত পুরোপুরি অতিক্রম করতে পারেনি আজও। তবে মরেছে কী? না মরেনি। আমাদের মাঝেই রাসেল বেঁচে থাকবে চিরদিন ছোট্ট রাসেল হয়ে। আমাদের বন্ধু হয়ে।

বাবার সাথে রাসেলের স্মৃতি: রাসেল ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র এবং পরিবারের আদরটা সব থেকে বেশি সেই পেত। বাসায় ফিরে ঘরে ঢুকে বাবা প্রথমে তাকেই খুঁজতেন এবং ভরাট কণ্ঠে ডাক দিতেন রাসেল বলে। বাবার ডাক শোনার সাথে সাথে রাসেল দৌড়ে এসে কোলে উঠে পড়ত। বাবার চশমাটাকে দারুণ লাগত তার এবং সেটা তার নিজের চোখে লাগিয়ে বেশ মজা

পেত। বাবা অবসরে থাকলেই গল্প শোনানোর জন্য আবদার জুড়ে দিত রাসেল। বঙ্গবন্ধুও সময় পেলে বেশ আগ্রহ নিয়ে গল্প শোনাতেন। তবে রূপকথার গল্প নয়, বাবা শোনাতেন একটি নিপীড়িত দেশ, তার মানুষ, সংগ্রামের ইতিহাস, স্বাধীনতা অর্জনের গল্প।

রাসেলও গল্প শোনাত তার বাবাকে। রাসেল নাকি কথা বলত খুব মজা করে। বরিশাল, ফরিদপুর ও ঢাকার আঞ্চলিক ভাষায় শিশু সুলভ কথা খুব মিষ্টি শোনাত। বাবা রাসেলকে সব সময় পাশে বসিয়ে খাওয়াতেন। এত ব্যস্ততার মাঝেও বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন একজন প্রিয় পিতা। পিতা পুত্র পরিবারের আনন্দঘন আড্ডায় পুরো বাড়ি যেন স্বর্গ হয়ে উঠত।

পরিবারের সাথে রাসেলের স্মৃতিঃ রাসেল ছিল সবার বড় আদরের। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হওয়ায় তার যত্নের কোন সীমা ছিল না। সব ভাই বোনেরা তাকে চোখে চোখে রাখত। তার গায়ে যেন এতটুকু আচড়ও না লাগে। সে পরিবারের সবার সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠে। তার বড় ফুফু, মেজো ফুপু, মা, বড় আপা, আপা, ভাই জামাল, কামাল সবার চোখের মনি ছিল শেখ রাসেল। তার বাসার পারিবারিক লাইব্রেরি থেকে তার বোনেরা তাকে গল্পের বই পড়ে শোনাত। স্কুল বন্ধ থাকলে হাসু আপার চুলের বেনী ধরে খেলতে সে খুব পছন্দ করত। কারণ লম্বা চুলের বেনী তার মুখে লাগত তখন সে খুব মজা পেত। এইসব স্মৃতি শেখ হাসিনা "আমাদের ছোট রাসেল সোনা" বইয়ে এভাবে উল্লেখ করেন- "জন্মের প্রথম দিন থেকেই ওর ছবি তুলতাম, ক্যামেরা থাকত আমাদের হাতে। ওর জন্য আলাদা অ্যালবাম করেছিলাম। দুঃখের বিষয় ঐ ছোট অ্যালবামটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী লুট করে নেয়। হারিয়ে যায় আমাদের অতি যত্নে তোলা ছোট্ট ভাইটির অনেক দুর্লভ ছবি"।

মানবতা ও নেতৃত্বের প্রতীকী শিশু রাসেলঃ সেই ছোট্ট বয়স থেকেই রাসেলের ছিল অসাধারণ নেতৃত্বসুলভ ও মানবিক আচরণ। ঢাকায় তার তেমন খেলার সাথী ছিল না। কিন্তু পরিবারের সাথে যখন টুঙ্গিপাড়ায় বেড়াতে যেতেন সেখানে তার খেলার সাথীর অভাব হত না। রাসেল নিজেই বাচ্চাদের জড়ো করতেন। তাদের জন্য খেলনা বন্দুক বানাতেন এবং বন্দুক হাতে তাদের প্যারেড করাতেন। রাসেলের ঐ ক্ষুদে বন্ধুদের জন্য সে জামা কাপড় ঢাকা থেকে কিনে নিয়ে যেত। প্যারেড শেষে খাবারের ব্যবস্থাও করত সে। আর বড় হয়ে তুমি কী হবে প্রশ্ন করলে সে উত্তরে বলত "আর্মি অফিসার হবো"। শুধু মানুষের প্রতি নয়, পশুপাখিদের প্রতিও ছিল তার অগাধ ভালবাসা। সে নিজে কবুতর পালত কিন্তু কবুতরের মাংস খেত না। তার পালিত কুকুর টমির সাথে ছিল গভীর বন্ধুত্ব। টমির সাথে রাসেল খেলা করত এবং নিজের খাবার টমিকে খাওয়াত। প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হয়েও অহমিকাবোধ তার মধ্যে কখনো ছিল না। রাষ্ট্রীয় প্রটোকল ভেঙে সে তার বাই সাইকেল নিয়ে স্কুলে যেত। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিদেশী রাষ্ট্রদূত, সরকারি আমলাদের সাথে তার আচরণ এবং সাধারণ মানুষের সাথে তার আচরণে কোনো পার্থক্য ছিল না। তার মন মগজ আর শরীরের প্রতিটি শিরায় উপশিরায় বহমান ছিল ব্যক্তিত্ব, মানবতাবোধ আর ভিন্নতা- যা অনায়াসেই রাসেলের ভক্ত হয়ে যেত যে কেউ।

জেল গেটে ছোট্ট রাসেলঃ শেখ রাসেলের প্রথম কারাগার দেখা ১৯৬৬ সালের ৮ই মে। বয়স তখন তার দেড় বছর। বঙ্গবন্ধু সেবার বন্দী হন ছয় দফা প্রদানের পর বিনা বিচারে। পরিবারের সাথে যখন রাসেল তার বাবার সাথে দেখা করতে যায় তার সাথে গোয়েন্দারা অত্যন্ত অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। তার প্রিয় হাসুপা প্রতি ১৫ দিন পর পর পরিবারের সাথে রাসেলকে নিয়ে দেখা করতে যেত। রাসেলকে নিয়ে গেলে ও আসতে চাইত না। খুব কান্নাকাটি করত এবং তখন তাকে বোঝানো হত জেলখানা তার "আব্বার বাড়ি" আর তারা সেখানে বেড়াতে এসেছে। কারণ জন্মের পর থেকে বেশিরভাগ সময় শিশু রাসেল দেখেছে তার বাবা তাদের বাসায় থাকেন না। থাকেন কারাগারে। কারা ফটকে দাঁড়িয়ে দেড় বছরের শিশু রাসেল হাসত না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে তার বাবার দেখা পেত। এভাবেই দেখতে দেখতে বছর কেটে যায়। শিশু রাসেলও বড় হচ্ছে। সে তার বাবাকে চায়। কিন্তু বাবা তো তার "আব্বার বাড়ি" তে (কারাগারে)। বাবার অভাব পূরণ করতে মাকেই আব্বা বানালেন বেগম মুজিব।

বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে বাড়ি ফিরে রাসেলকে কাছে ডাকলে রাসেল অভিমান করে বেগম মুজিবের গলা ধরে বলে 'তুমিই আব্বা'। বঙ্গবন্ধু তাঁর 'কারাগারের রোজনামচা' তে উল্লেখ করেন, "রাসেল একটু বড় হয়েছে। কিন্তু কারাগার থেকে চাইলেই কেউ বের হতে পারে না এটা বোঝার মত বড় সে হয়নি। ছেলেটা এসে বলে, 'আব্বা (বালি) চলো'।"

শিশু রাসেলের বন্দীজীবনঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রিয়তম স্ত্রী ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ১৯৬৬ সালে বেশ ক্ষোভের সঙ্গেই বলেন- 'বাপের পেছনে গোয়েন্দা লেগেছিল ২৮ বছর বয়সে আর ছেলের পেছনে লাগল দেড় বছর বয়সেই'। সে সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন কারাগারে বন্দী। কিন্তু তখনও বঙ্গমাতা ভাবতে পারেননি যে এই ঘটনার ৫ বছর যেতে না যেতেই রাসেলকেও বন্দী জীবন কাটাতে হবে। সময়টা সাধারণ সময়ের মত নয়, ১৯৭১ সালের মার্চ মাস। বঙ্গবন্ধুকে আটক করে পাকিস্তান কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয় আর শেখ রাসেলকে বঙ্গমাতা, দুই বোন সহ পরিবারের বেশ কিছু সদস্যকে ধানমন্ডির ১৮ সড়কের বাড়িতে আটক করে রাখা হয়। এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা "আমাদের ছোট রাসেল সোনা" বইতে বলেছেন, ছোট্ট রাসেলও বন্দী জীবন শুরু করে। ঠিকমত খাবার দাবার নেই। কোন খেলনা নেই, বইপত্র নেই, কী কষ্টের দিন যে ওর জন্য শুরু হলো। প্রথম দিকে আব্বার জন্য খুব কান্নাকাটি করত, তার ওপর আদরের ভাই কামালকে পাচ্ছে না, তা যে ওর জন্য কী কষ্টকর!

হত্যাকান্ড: পৃথিবীতে যুগে যুগে রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেছে কিন্তু এমন নির্মম, নিষ্ঠুর এবং পৈশাচিক হত্যাকান্ড আর কোথাও ঘটেনি। শেখ রাসেল বেদনার এক মহাকাব্যের নাম। মা, বাবা, দুই ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী, চাচার লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নিতে নিতে শিশু রাসেলকে প্রতিটি লাশের সামনে মানসিক ভাবেও খুন করেছে। একান্ত আপনজনের রক্তমাখা নিরব, নিথর দেহগুলোর পাশে নিয়ে গিয়ে শিশু রাসেলকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল, জঘন্য কর্মকান্ডের দৃশ্যগুলো দেখিয়ে তাকে ভেতর থেকেও হত্যা করে সর্বশেষে বুলেটের নির্মম আঘাতে রাসেলের দেহ থেকে অবশিষ্ট প্রাণ ভোমরাটিকেও চিরতরের জন্য নিরব নিস্তব্ধ করে দিয়েছে বর্বর খুনিরা। মৃত্যুর আগে আতঙ্কিত শিশু রাসেল কেঁদে কেঁদে বলেছিলো, 'আমি মায়ের কাছে যাব'। পরবর্তী সময়ে মায়ের লাশ দেখার পর অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে মিনতি করেছিলেন, 'আমাকে হাসু আপার কাছে পাঠিয়ে দিন'। যাদের সান্নিধ্যে স্নেহ আদরে হেসে খেলে বড় হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল, কী কষ্টই না পেয়েছিল!

এ প্রসঙ্গে শিশু রাসেলকে নিয়ে লেখা দুই বাংলার বিখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের "শিশুরক্ত" কবিতায় উল্লেখ করেছেন-

"তুইতো গল্পের বই, খেলনা নিয়ে
সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন বয়সেতে ছিলি
তবুও পৃথিবী আজ এমন পিশাচি হলো
শিশুরক্তপানে তার গ্লানি নেই?
সর্বনাশী, আমার ধিক্কার নে!
যত নামহীন শিশু যেখানেই ঝরে যায়
আমি ক্ষমা চাই, আমি সভ্যতার নামে ক্ষমা চাই।"

যে শিশু চির শৈশবেই বেঁচে থাকবে হাজার বছর: রাসেল আমাদের অস্তিত্বের অনুভূতি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে, পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ থাকবে, ততদিন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে শেখ রাসেলও বেঁচে থাকবেন। শেখ রাসেলের হাসুপা (শেখ হাসিনা) আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী। ১৬০ মিলিয়ন মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের দায়িত্ব নিয়েছেন। আজ দিকে দিকে ভাগ্যোন্নয়নের দিতে তাঁর জয়ধ্বনি।

রাসেলের হাসুপা খুনিদের বিচার করেছেন। এতে নিশ্চয়ই রাসেলের আত্মা কিছুটা শান্তি পাবে। আর তার হাসু আপাও তাঁর প্রিয় রাসেলকে খুঁজে পাবেন লাখো কোটি রাসেলের মাঝে। এই বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, লাল সবুজের পতাকাসহ যেখানে যেখানে ছড়িয়ে আছে বীর বাঙালির ইতিহাস সেখানেই শেখ রাসেল। আমাদের প্রয়োজন ছোট্ট মানবশিশু শেখ রাসেলের মানবতাবোধ, ছোট বয়সেই নেতৃত্বসুলভ আচরণ, পরোপকারী মনোভাবগুলো আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার আরও ব্যবস্থা করা এবং প্রসারিত করা। শেখ রাসেল আজ বাংলাদেশের প্রতিটি শিশু-কিশোর, তরুণ, শুভবোধ সম্পন্ন মানুষের কাছে একটি আদর্শ ও ভালবাসার নাম।

"রাসেল আছে সকল মায়ের
দুচোখে ভরা জলে
রাসেল আছে ভোরে জাগা
শিশুর কোলাহলে।"

যবনিকা: ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুকে পৃথিবীতে বাঁচতে দেয়নি নরপশুরা। শেখ রাসেল নিজেকে কিভাবে গড়ে তুলত তা বলার উপায় নেই। তবে পারিবারিক ঐতিহ্য, আদর্শের উত্তরাধিকার তার চরিত্র গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত, তাতে সন্দেহ নেই। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, অন্তত এই দেশ, দেশের মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধ থাকত তার অন্তর ও চেতনা জুড়ে। পরিণত হয়ে উঠত দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য। তার আগ্রহের বিষয়গুলো আয়ত্ব করে সেখানে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারত। আজ রাসেল থাকলে একজন মেধাবী মানুষ বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে থাকত প্রথম সারিতে। শেখ রাসেল হোক আমাদের শিশুদের অনুপ্রেরণা। বাংলাদেশ তাকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে আজও এবং চির অম্লান হয়ে বেঁচে থাকবে আজীবন বাঙালির মনের গহীনে। উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে আমাদের বন্ধু শেখ রাসেল।

মুদ্রণে: রূপকথা প্রেস, সরকারি ব্রজলাল কলেজ রেল গেটের বিপরীতে, সৌদিয়াপুর, খুলনা, ০১৭০৩ ৬২ ৮০ ৬২